আট-আনা সংস্করণ-গ্রন্থমালার ষড়শীতিতম গ্রন্থ

অকাল কুষ্মাণ্ডের কীর্ত্তি

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

চৈত্র—১৩২৯
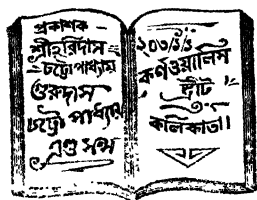
প্রিণ্টার—শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঙার
ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

অকাল কুষ্মাণ্ডের কীর্ত্তি

(এ কে চন্দ্র)

"পিচিমা, পিচিমা,—'ওরে বুড়বাক্, পিচিমা—"

সকাল বেলা উপর হইতে নামিয়া সেইমাত্র দ্বিতলের নিভৃত পাঠাগারটিতে ঢুকিয়া আরব্ধ রচনাটীতে মন দিবার জন্য টেবিলের কাছে চেয়ারে বসিয়া কলমটি হাতে তুলিয়াছি, এমন সময় কল্যাণীয়া ভাইঝি কাকাতুয়া রাণীর বিচিত্র ভাষার আহ্বানের সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত গালি কাণে পৌঁছিল।

সবিস্ময়ে উঠিয়া টেবিলের পাশের জানালা হইতে উঁকি মারিয়া দেখিলাম, সামনের খোলা ছাদে কল্যাণীয়াটি একলাই লম্ফ ঝম্ফ ছুটাছুটি করিতেছে! হাতে খানিকটা সূতা সমেত একখানা ঘুড়ি। মুখে অবিশ্রাম চীৎকার,—"ওলে, পোগাল্ মুকি ঘুলি-লে তুই কেন—উলছিস্, না লে !—"

ডাকিয়া বলিলাম "কি বল্‌ছ তুতু? পিসিমা বলে, ডাক্‌ছ কি তুমি?"– কাকাতুয়াকে আমি সংক্ষেপে তুতু বলিতাম।

তুতু দৌড়-ঝাঁপ বন্ধ করিয়া গম্ভীর হইয়া "হাঁ, একবাল্ এচো তো এখানে। পিচেল্ দলকাল্।"

"পিচেল্ দল্‌কাল্'—অর্থাৎ বিশেষ দরকারটা যে কি, কিছুই বোধগম্য হইল না. কিন্তু এ জোর হুকুম অগ্রাহ্য করিবার মত 'ঘাড়ে রক্ত' আমার মত নিরীহ প্রাণীর নাই। মনে মনে হাসিয়া মা সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া কলমটি রাখিয়া বাহিরে আসিয়া বলিলাম "কি দরকার বল।"

তুতু তখন খুব গম্ভীর হইয়া, ছোট্ট কচি হাত

দুখানায় ঘুড়ির দু কাণ ধরিয়া,—একান্ত মনোযোগে ঘুড়ির আ-ল্যাজ-মস্তক পর্য্যবেক্ষণে নিযুক্ত ছিল। আমার কথা শুনিয়া বিনা দ্বিধায় ঘুড়িটি আমার হাতে দিয়া, অম্লান বদনে আদেশ করিল, "একবাল্ ধলাই দাও তো পিচিমা, ঘুলিখানা ওলাই।"

ঘুড়ি ধরাই! সর্ব্বনাশ! সাতবার মরিয়া ফিরিয়া আসিলেও যে ও বিদ্যায় দন্তস্ফুট করা আমার ধাতে অসম্ভব। কাতর হইয়া বলিলাম "দ্যাখো তুতু, আমি আমি তো কখনো ঘুড়ি ধরাই দেওয়া শিখিনি—"

তুতু পরম নিশ্চিন্তভাবে ঘাড় নাড়িয়া সান্ত্বনাভরা বিজ্ঞতার সহিত বলিল "তাল্ আল্ হয়েছে কি? আমি ছিকিয়ে দিচ্ছি,—এই এম্নি কলে ঘুলি ধলবে, তা'পল নেই আমি ছুতো তান্‌ব, অম্নি ছেলে দেবে।"

বুঝাইয়া দেওয়া সহজ, বুঝিয়া লওয়াই শক্ত। মনে মনে হিসাব করিয়া ভাবিলাম, আজ সকালে কতকটা সময় নষ্ট হওয়া এবং তুতুর কতকগুলা যথেচ্ছ গালাগালি ভোগ করাই অদৃষ্টের অনিবার্য্য বিধান!—অদৃষ্টের অনেক দুর্ভোগ-লাঞ্ছনাই শক্তির অভাবে সহিষ্ণু হইয়া

নিঃশব্দে ভোগ করিয়াছি! প্রতিকারের ক্ষমতা হাতে ছিল না বলিয়া, নিরীহপ্রাণ মেষের মত চমৎকার ক্ষমাশীল সাজিয়া,—পৃথিবীর কত ক্ষমতা-দম্ভের কত নৃশংস অত্যাচার মাথা পাতিয়া লইয়াছি, সে সব যদি চোখ বুজিয়া 'কপালের ভোগ' বলিয়া মানিতে পারি, তবে এই ছোট্ট শিশুর সরল প্রাণটিকে একটু খুসী করিয়া দিবার জন্য স্বেচ্ছায় না হয় কিছু 'কপালের ভোগ' আজকার মত বরণ করাই যাক্।

কোন তর্ক না করিয়া যথাশিক্ষা ঘুড়ি ধরাই দিলাম। প্রথম উদ্যমে ঘূড়ি মহা উল্লাসে দুই লাফে দশ হাত উচুতে উঠিয়া, ঠক করিয়া মাটীর উপর চিৎ হইয়া পড়িল। উড়াইয়া দিবার ভার পাইয়াছি,—উড়াইয়া দিয়া খালাস। অধঃপতনের জন্য আমি দায়ী নই। কিন্তু সে কথা শোনে কে? তুতু রাগে ক্ষোভে কাঁদ্ কাঁদ হইয়া সজোরে আমাকেই ধমক দিল:—"দুৎ, তুমি বলো বোকা! নাও, আবাল্ ধলাই দাও!"

বিনা বাক্যে 'আদেশ-পালন করিলাম। কিন্তু হায় দুর্ভাগ্য! সেবারে যদি বা দশ হাত উঠিয়াছিল, এবারে

পাঁচ হাত উঠিয়াই ঘুড়ি সশব্দে এমন সাংঘাতিক আছাড় খাইয়া পড়িল যে, 'কাণা' ছিঁড়িয়া বেচারার জীবাত্মা জন্মের মত ইহধাম ছাড়িল। সঙ্গে সঙ্গে শোকাকুল তূতুরও ধড়াস করিয়া পতন, এবং উভরায় ক্রন্দন!

ঘুড়িখানা ছিঁড়িয়া যাওয়ায় প্রাণে স্বস্তির বাতাস লাগিল! যাক্, আর ধরাই দিতে হইবে না ত'!—নিশ্চিন্তচিত্তে, তূতুর দারুণ শোকে দস্তুরমত সমবেদন জানাইয়া—কান্না ভুলাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এমন সময় বাড়ীর ছোট চাকর রামজয় কোথা হইতে ঝড়ের মত ছুটিয়া আসিয়া রুদ্ধশ্বাসে হাঁপাইতে হাঁপাইতে সংবাদ দিল, "তূতুদিদি, ফটকের পাশে সেই চানাচুরওয়ালার দোকানে এখন গরম গরম চানাচুর তৈরী হচ্ছে।"

তূতুর প্লীহার দোষের কথা গরজের তাড়ায় আমার মনে পড়িল না, আশু বিপন্মুক্তির পথ পাইয়া তটস্থ হইয়া হইয়া বলিলাম, "চলো চলো, আমি পয়সা দিচ্ছি, কিনে নিয়ে এসো।"

তূতুর একশো দশ ডিক্রির উপর ওঠা শোকবিকার হঠাৎ সাড়ে আটানব্বই ডিক্রীর নীচে নামিয়া গেল!

আমি হাঁপ ছাড়িয়া, মনে মনে রামজয়ের ঊর্দ্ধতন সাত পুরুষ এবং চানাচুরওয়ালার চৌদ্দ পুরুষকে সহস্র ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া, তুতুকে বুকে করিয়া আনিয়া পড়ার ঘরে একটা চেয়ারে বসাইয়া রামজয়কে গোটা কতক পয়সা দিয়া বিদায় করিলাম।

তুতু চেয়ারে বসিয়া চক্ষু-লজ্জার খাতিরে একবার চোখ রগড়াইতে সুরু করিল। আমি কলমটি তুলিয়া লইয়া লেখার খাতায় ঝুঁকিয়া পড়িলাম।

চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে তুতু খানিকটা নীরবে ভাবিয়া চিন্তিয়া, শেষে অধোবদনে বলিল, "চানাচূল্ ভাজা খেয়ে ছলোচ্ছতি পূজোয় পুষ্পান্ছলি দেওয়া চল্‌বে তো? আজ ছলোচ্ছতি পূজো জানো তো?—"

খাতার দিকে চোখ রাখিয়া আমি সংক্ষেপে বলিলাম "জানি বৈ কি আজ সরস্বতী পূজা। তা চা নিম্‌কি খেয়ে যদি পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া চলে, তাহলে চানাচুর ভাজায় আটক থাবে না।"

শয্যা ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে প্রাতঃকালেই তুতুর চা নিম্‌কি সেবন হইয়াছে। সেটা আমার জানা ছিল।

মুহূর্ত্তে সিঁড়িতে চট্ পট্ জুতার শব্দ! সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ির ধারে জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র ত্র্যম্বক বাবাজী স্মিতমুখে বলিলেন, "ওখানে কে, পিসিমা? চানাচুর খেয়ে পুষ্পাঞ্জলি দেবার বিধান দিচ্ছেন কাকে?—কাকাতুয়াকে বুঝি?" ত্র্যম্বক সকৌতুকে হাসিয়া ফেলিল।

লজ্জায়, ক্ষোভে, রোষে, 'আঁক', করিয়া উঠিয়াই,—মুহূর্ত্তে তুতু দৃপ্তা বাঘিনীর মত ঘাড় বাঁকাইয়া তীক্ষ্নস্বরে বলিল "পেচ্! তোমার নছ্‌মনিয়া তো খুব ভালো!—" "পেচ" অর্থাৎ—বেশ!

নিরীহ ত্র্যম্বক বেচারী, গোপন লজ্জায় নিতান্ত অস্থির বিচলিত হইয়া, বিনা বাক্যে দ্রুত প্রস্থান করিল। ত্র্যম্বক ছেলেটি বয়সে কিশোর, এবং এখন সবে মাত্র সেকেণ্ড ক্লাসে পড়িতেছে, এ হেন, দুঃসময়রূপী একান্ত অসময়ে, পূজনীয় অভিভাবকগণ তাহাকে বাল্য-বিবাহের আধ্যাত্মিক মর্ম্মও বুঝাইয়া দেন নাই, এবং সে ব্যাপারের 'যুগ-যুগ-বন্দিত' রূপ রস আস্বাদন পরীক্ষার অবসরও দেন নাই,—ইহা ধ্রুব সত্য। কিন্তু কেমন করিয়া জানি

না, ত্র্যম্বকের সমবয়সী সহপাঠী, অকাল-কুষ্মাণ্ড ছোট কাকাটি,—হঠাৎ ইতিমধ্যে কোথা হইতে এক লছমনিয়া আবিষ্কার করিয়া নিরীহ ত্র্যম্বক বেচারীর ঘাড়ে চড়াইয়া এমন বজ্রলেপ মারিয়া বেমালুম জোড় খাওয়াইয়া দিয়াছে যে, দুর্ব্বল বেচারীর পক্ষে সেটা ঘাড় হইতে ঝাড়িয়া ফেলিবার সামর্থ্যও যেমন নাই, সে দুর্ব্বহ ভার ঘাড়ে বহন করাও তেমনি সাংঘাতিক ব্যাপার। বিশেষ করিয়া,—আমাদের মত ছোট খাটো গুরুজনদের সামনে ত্র্যম্বকের কাকামহাশয়, এবং তস্য মন্ত্র-দীক্ষিত শিষ্য-শিষ্যার দল, যখন 'লছম্‌নিয়া' শব্দটিতে লক্ষ্ণৌ ঠুংরীর সুর চড়াইত, তখন ত্র্যম্বক বাবাজী ত' ছেলে মানুষ, আমরাও গাম্ভীর্য্য রক্ষার নিষ্ফল চেষ্টায় রীতিমত বিব্রত হইয়া পড়িতাম।

ত্র্যম্বক পলাইয়া যাওয়ায় তুতুকে ঠোঁট বন্ধ করিতে হইল। আমি হাসি চাপিয়া, ঘাড় হেঁট করিয়া লিখিতে সুরু করিয়া দিলাম।

মিনিট দুই নিস্তব্ধতার ভিতর দিয়া কাটিল,—হঠাৎ তুতুর আকস্মিক কৌতুকোচ্ছ্বসিত উচ্চ কলহাস্য ধ্বনিতে

চমক-ভাঙ্গা হইয়া চাহিয়া দেখি, ত্র্যম্বকের সেই অকাল-কুষ্মাণ্ড কাকা—অর্থাৎ আমার পরম স্নেহের মূর্ত্তিমান উপদ্রব-রূপী কনিষ্ঠ সহোদর উপদ্রব-চন্দ্র আমার চেয়ারের পিছনে আবির্ভূত হইয়াছেন! মুখে বিরাট গাম্ভীর্য্য, চোখে দুষ্ট বুদ্ধির উজ্জ্বল কৌতুক-দীপ্তি।

মাথার উপর বড় দরের মুরুব্বি যাঁহারা আছেন, তাহাদিগের স্নেহদৃষ্টিতে আর যে চোখে দেখিতে হয় হউক ভয়ের চোখে দেখিতে হয় না, কিন্তু বাড়ীর এই দুইটি ছোট দরের মুরুব্বিকে—আমি হলপ্ করিয়া বলিতে পারি, বড় ভয়ানক ভয়ের চোখে দেখি!—প্রথমটি উপদ্রব, দ্বিতীয়টী ভুতু!—কলমটি রাখিয়া ভয়ে ভয়ে চোখ ফিরাইয়া সবিনয়ে বলিলাম, "কি খবর ভাই?"

উপদ্রব গায়ের কাপড়ের ভিতর হইতে হাত দুটি বাহির করিল, দেখিলাম ভ্রাতৃবরের বাঁ হাতে একটি শানানো বাটালী, ডান হাতে একটি লোহার হাতুড়ী।

উপদ্রব বাটালিটা আমার ব্রহ্মতালুতে স্থাপন করিয়া হাতুড়ীটা তাহার উপর পিটাইতে উদ্যত হইয়া,

বেশ সপ্রতিভ গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিল "তোমার মাথার খুলির জোড়াটা খুলে মগজটা আজ একবার আমায় এক্‌জামিন কর্‌তে হবে ভাই।"

আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই! উপদ্রব-চন্দ্রের এই ধরণের আব্‌দার্‌গুলা অন্যের কাছে যতই অসহ্য—অদ্ভুত ঠেকুক্—আমার কিন্তু দুবেলার অভ্যস্ত গা-সহ ব্যাপার! একটু হাসিয়া বলিলাম "তোমার পরীক্ষা-কৌতূহল মেটাতে খুসীর সঙ্গেই রাজি আছি, মগজটা এক্ষুণি দান করে দিচ্ছি।—কিন্তু হাতের এই রচনাটা শেষ না কর্‌লে, আমার আত্মা-বেচারীর স্বস্তি নাই, অতএব তোমার মগজটা আপাততঃ কিছুক্ষণের জন্য ধার দাও।"

উপদ্রব সশব্দে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া হাতুড়ী ও বাটালিটা টেবিলের উপর রাখিয়া দারুণ আক্ষেপ-ভরা ভৎর্সনার স্বরে বলিল, "নাঃ, তুমি বড় অকৃতজ্ঞ, বড় নিমকহারাম লোক, ভাই! তোমার একটুও চক্ষুলজ্জা নাই!"

হাসিয়া বলিলাম "কিছুমাত্র না! বুঝ্‌তেই তো

পার্‌ছ ভাই! এবার ভাল মানুষের মত নিজের পথটি দেখো তো দাদা, প্রাণ-খুলে আশীর্ব্বাদ করে, নিজের কাজে মন দি।"

উপদ্রব সজোরে মাথা নাড়িয়া বলিল "নাঃ, সে কিছুতে হতে পারে না! আজকের এমন জলজ্যান্ত সরস্বতী পূজোর দিনে, তুমি যে কালী কলম নিয়ে মা সরস্বতীকে খোঁচা দিয়ে জখম কর্‌বে, এ অনাচার আমি কিছুতেই সহ্য কর্‌তে পার্‌ব না।"

মা সরস্বতীর প্রচণ্ড আচার-নিষ্ঠ ভক্তের এই অহৈতুকী ভক্তিভরা আকস্মিক দরদবোধ দেখিয়া বড় হাসিও পাইল,—ভয়ও হইল! সবিনয়ে বলিলাম "দোহাই উপদ্রব,—"

উপদ্রব বাধা দিয়া বলিল, "সেই বেলা সাড়ে এগারটার পর পূজা হয়ে গেলে, তবে আমরা পুষ্পাঞ্জলি দিতে পাব, তবে জলযোগ, চা-যোগ, সুপারী-যোগ সব যোগ কর্‌তে পাব। অতএব তার আগে এই মধ্যবর্ত্তী কালটায়—" বাকী কথা বলিতে উপদ্রব, ঘাড় চুল্‌কাইয়া, মুখ কাঁচু মাচু করিয়া বেশ একটু ইতস্ততঃ করিতে সুরু

করিল। আমি শঙ্কিত হইয়া বলিলাম, "অতএব এই মধ্যবর্ত্তী কালটায়' যত কিছু গোলযোগের মহাযোগ, আমারই ঘাড়ের উপর দিয়ে নির্ব্বিবাদে সুসম্পন্ন হবে, কেমন ?"

উপদ্রব সশব্দে চট্ করিয়া এক নমস্কার ঠুকিয়া উৎফুল্ল মুখে বলিল "আহা, সাধু! সাধু! এমন না হলে দিদি! সাধে কি ভাই, তোমার মাথা ভেঙে মগজ একজামিন্ করতে ছুটে আসি?—নাঃ, তোমাতে আমাতে যে একটা প্রকাণ্ড বড় নৈসর্গিক স্নেহবন্ধন তার আছে, কোন ভুল নাই। না হলে আমার মনের কথা তুমি এমন করে বুঝবে কি করে ভাই!"

প্রশংসার স্তব গান শুনিয়া শরীর জুড়াইয়া গেল আর কি! হতাশ হইয়া চেয়ারের পিঠে হেলিয়া পড়িয়া সকরুণ স্বরে বলিলাম, "হায় মা সরস্বতী দেবী!— তোমার পূজার দোহাই দিয়েও এই সব প্রেত-কীর্ত্তনের উদ্দাম দাপট।"

উপদ্রব সে কথায় কর্ণপাত মাত্র না করিয়া প্রশান্ত-নির্ভীক চালে ঘরের মেঝেয় পায়চারি করিতে করিতে

মনে মনে কি একটা মতলব ভাঁজিতে সুরু করিয়া দিল। আমি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তার দুষ্টামী-পরিপক্ক হাত পা কয়-খানির দিকে চাহিয়া, শঙ্কিতচিত্তে ভাবিতে লাগিলাম :—
"না জানি, আমার কি শ্রাদ্ধ-আয়োজনই হইবে !"

(দুয়ে—পক্ষ)

খানিকটা চুপ চাপ পায়চারী করিয়া, উপদ্রব সহসা টেবিলের জানালার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া চীৎকার করিল, "ত্র্যম্বক, ত্র্যম্বক, ওহে ত্র্যম্বক, ডাকপিওন বাবাজীটি লেটার বক্সে কিছু দিয়ে গেছে কি না দেখো তো ভাই—"

সম্পর্কে খুড়া-ভাই-পো হইলেও, সম্ভাষণের সময় উভয় পক্ষেই,—'ভাই'—সম্বোধন অবাধে ব্যবহৃত হইত।

ত্র্যম্বক নীচে-তলা হইতে সাড়া দিল, ডাকপিওন আজ আসে নাই। উপদ্রব তৎক্ষণাৎ ব্যস্তসমস্ত হইয়া ডাকিল, "শোন, শোন, চট্ করে দৌড়ে এস এখানে, তোমার পিসিমা তোমায় একবার ডাক্‌ছেন।"

আমি ব্যস্ত বিব্রত হইয়া বলিলাম "কই, আমি তো,—"

উপদ্রব জোড় হাতে নতজানু হইয়া মিনতিপূর্ণ স্বরে বলিল "মাপ করো ভাই,—তুমি ঘণ্টা খানেকের জন্য চুপ করে থাক, না হলে, আমাদের যথাসর্ব্বস্ব 'সব মাটী' হয়ে যাবে।"

উপদ্রবের যথাই বা কি, আর সর্ব্বস্বই বা কি—তার কোন খোঁজ খবর কিছুই জানিতাম না। কিন্তু পৃথিবীর কোন প্রাণীর 'সব-মাটী' করিয়া দিবার জন্য, কিছুমাত্র উৎসাহ আমার ছিল না। কাজেই অনুরোধ মত নির্ব্বাক, নির্ব্বিকার-চিত্ত হইয়া নিস্পন্দভাবে বসিয়া রহিলাম। মা-সরস্বতী যখন আজ নিতান্তই এমন দুষ্ট মূর্ত্তিতে ছেলেদের হৃদয়-ঘটে, দৌরাত্ম্যের পূজা গ্রহণ করিতে আবির্ভূতা হইয়াছেন, তখন আমার প্রাণের পূজা-নিবেদন-চেষ্টাটা, আপাততঃ মনের মধ্যেই মুলতুবী থাক।

ইতিমধ্যে উপদ্রবচন্দ্র তুতুর কাছে গিয়া, কাণে কাণে কি-যে গুরুমন্ত্র উপদেশ করিলেন, জানি না,—মুহূর্ত্তে তুতুরাণী,—ইলেকট্রিক্-ব্যাটারী-চালিত বাঁদরটীর মত তুড়ুক্ করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া, খিল্-খিল্ হাস্তে

ঘরের চারিদিক ভরাইয়া সাহ্লাদে বলিল "আচ্ছা ভাই-কাকা, চলো।"

আমি সংশয়াকুল হইয়া বলিলাম "কোথায়?"

"আস্‌ছি—এক্ষুণি।"—বলিয়া তুতুকে কাঁধে উঠাইয়া লইয়া উপদ্রব দ্রুত অন্তর্দ্ধান করিল।

সিঁড়িতে চট্ চট্ জুতার শব্দ হইল, সঙ্গে সঙ্গে ত্র্যম্বক-বাবাজী ঘরে ঢুকিয়া বলিল "পিসিমা, আপনি আমায় ডাকছেন?"

বিপন্ন হইয়া কি উত্তর দিই ভাবিতেছি, এমন সময় জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র, কল্যাণীয় ভ্রাতা শ্রীমান সূর্য্যপ্রকাশ, তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ প্রবল-ভারিক্কি ভাব পূর্ণ, গ্রাম্ভারী চালে ঘরে ঢুকিয়া, বেশ ধীরে সুস্থে সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন "দিদি, শুনছেন, মেড়ুয়া-মুল্লুক থেকে আমাদের মান্যবর বেই মশাই এসে উপস্থিত হয়েছেন, সঙ্গে কন্যারত্ন!—"

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম "কে?"

নিরীহ ত্র্যম্বক বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া বলিল "কে এসেছে সূর্য্য-কা? আপনাদের আবার বেই কে?"

সূর্যাপ্রকাশ বয়সে ইহাদের চেয়ে কিছু বড় হইলেও এবং গ্রাম্ভাবিত্বের জন্য ভ্রাতৃজায়া ঠাকুরাণীদের কাছে "মুরুব্বি" উপাধি পাইলেও,—ছেলে মহলে দুষ্ট বুদ্ধির মাহাত্ম্য-পচারে, ঠিক উপদ্রবেরই—দাদা! ত্র্যম্বকের ব্যগ্র-কৌতূহলে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া সূর্য্যপ্রকাশ বেশ ধীর গম্ভীর ভাবে একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া দারুণ-দুশ্চিন্তা-ক্লিষ্ট মুখে মাথা নাড়িয়া, বলিল "নাঃ, ব্যাপার বড় সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়ালো! এমন কাযও করে ত্র্যম্বক, ছ্যাঃ ছ্যাঃ!—"

তাহার কথা শুনিয়া,—বিশেষতঃ কথা বলার ভঙ্গী লক্ষ্য করিয়া, ত্র্যম্বক তো ছেলেমানুষ, আমি শুদ্ধ ভয় পাইলাম! কিন্তু মনে একটু সংশয় এবং কৌতূহলও বোধ হইল,—উপদ্রবের এই দাদাটি তো উপদ্রবের মন্ত্র-দীক্ষিত হইয়া আসেন নাই? বিশ্বাস কি?—আমি সন্দিগ্ধ-দৃষ্টিতে ভাইটির মুখভাব পর্য্যবেক্ষণে মন দিলাম, প্রকাশ্যে কিছু বলিলাম না।

ত্র্যম্বক কিছুক্ষণের জন্য হতবুদ্ধি-নির্ব্বাক থাকিয়া শেষে ভয়ে ভয়ে বলিল, "কি করেছি বলুন দেখি?

আমার তো কৈ কিছুই মনে পড়ছে না? কে বল্লে আপনাকে?"

মহা গাম্ভীর্য্যের সহিত সূর্য্যপ্রকাশ বলিল "আর কে বল্লে! ও কথা কি লুকুনো থাকে বাবা? মহা-পুরুষদের উক্তিই আছে যে,—'পাপ আর পারা কেউ হজম করতে পারে না'—তা এ তো আস্ত শুভকর্ম্ম, একটা সত্যিকার বিয়ে! কিন্তু তাও বলি বাবা, বাংলা মুল্লুকে এমন জগদ্বিখ্যাত আরামপ্রদ শ্বশুরকুল থাকৃতে, তুমি বেহার মুল্লুকে গিয়ে, শ্বশুর পাকৃড়ালে কি বলে? তাও আবার শ্বশুরের পদমর্য্যাদা কি?—না, রেলওয়ে ষ্টেসনের পয়েণ্টস্ম্যান! আরে ছ্যাঃ! ছ্যাঃ! লোকের কাছে বৈবাহিকের পরিচয় দিতে লজ্জায় আমাদের মাথা হেঁট হয়! ছ্যাঃ!"

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া, ত্র্যম্বক সলজ্জ অপ্রস্তুত হাসি হাসিয়া বলিল, "বাবা! তাই ভাল! আমার ভয় লেগে গিয়েছিল,—আপনি যা করে বলেছেন প্রথমে!—বলিহারী আপনাদের কল্পনা-শক্তিকে! আর আপনার উপদ্রব ভাইটির খুরে নমস্কার!—হাস্‌বেন্ না

পিসিমা,—ভাইটি আপনার আস্ত কল্কি-অবতার! কোত্থেকে কি যে সব অদ্ভুত অদ্ভুত খেয়াল টেনে-টুনে এনে জড় করে, আমার তো তাক্ লেগে যায়!—"

সূর্য্যপ্রকাশ, বিরাট গাম্ভীর্য্যের তুঙ্গ-শৃঙ্গে ঠিক অটল প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, সদর্পে মাথা নাড়িয়া বলিল, "আর বাবা! যা শ্বশুর তুমি নির্ব্বাচন করেছ, আমাদেরই তাক্ লেগে গেছে—তা তুমি! শ্বশুরের নামের বাহার কি? আহা অপূর্ব্ব সুন্দর নাম শুনেই বড় বৌদিরা মোহিত হয়ে পড়েছেন,—"

আমি নিরীহ ভাল মানুষীর সহিত বলিলাম,—"বড় বৌদিরা যখন মোহিত হয়েছেন, তখন ছোট বৌদিরা রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত থাক্‌লে বোধ হয় মূর্চ্ছাই যেতেন! কি বল ভাই?"

ত্র্যম্বক উচ্ছ্বসিত কৌতুকে হাসিয়া বলিল "ঠিক বলেছেন পিসিমা! বলুন তো আপনি একটু,—বেশ ভাল করে বলুন! বাবা, সবাই মিলে আমায় ক্ষেপিয়ে তোলবার যোগাড় করেছে! আচ্ছা সূর্য্য-কা, আপনি কি বলে উপদ্রবের সঙ্গে যোগ দিয়ে আমার পিছনে—"

অবিবাহিত কুমার সূর্য্যপ্রকাশ, 'ছোট বৌদিদের নামোল্লেখে একটুখানি সলজ্জ-সঙ্কোচ বোধ করিয়া চক্ষুলজ্জা গোপনের জন্য একখানা বই টানিয়া লইয়া চোখে আড়াল দিয়াছিল। ত্র্যম্বকের শেষ কথায়, মুখ তুলিয়া মাথা নাড়া দিয়া, বেজায় গম্ভীর স্বরে বলিল, "আহা, থাম না হে! বলি ব্রহ্মাণ্ডে এত নাম থাক্‌তে বেছে বেছে অমন বাহারে নাম-ওলা শ্বশুরটি পছন্দ করলে যে, সেটা, কোন দেশী বুদ্ধির কাজ বল তো হে? বাহার বলে বাহার!—স্বয়ং সাক্ষাৎ বাহার। নাম কি?—না 'তুল্‌কী বাহার।'

আমি হাসি সামলাইতে পারিলাম না, কষ্টে আত্মদমন করিয়া ত্র্যম্বক বাবাজীর মুখপানে চাহিয়া সবিনয়ে বলিলাম, "হাঁ বাবা, সত্যি এ নামের কোন্ প্রাণী বাস্তবিক পৃথিবীতে আছে না কি? বাস্তবিক, তুমি জান কিছু?"

ত্র্যম্বক হতাশ দৃষ্টিতে কড়িকাঠের দিকে চাহিয়া উদাস কণ্ঠে বলিল "কি জানি বলুন, আমার তো কল্পনায় পর্য্যন্ত আসে না! ও সব উপদ্রব-ই জানে,

আর সূর্য্যি-কা জানেন। নেন পিসিমা, আপনি কি বলছিলেন বলুন।"

আমি পূর্ব্বকথা ভুলিয়া, হঠাৎ বলিয়া ফেলিলাম "কই বাবা, আমি তো তোমায় কিছু বলি নি।"

ত্র্যম্বক বিস্মিত হইয়া বলিল—"উপদ্রব, আপনার নাম করেই যে আমায় ডাক্‌লে?—ও, এই সবের জন্যে বুঝি?—না, আমি চল্লুম পিসিমা—"

ত্র্যম্বক দ্রুত প্রস্থানোদ্যত হইল! মুহূর্ত্তে দ্বার-দেশে এক প্রকাণ্ড লাঠি হাতে প্রকাণ্ড লাল পাগড়ী মাথায়,—ঝল্ ঝলে ঝব্বা গায়ে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দাড়ি গোঁফ সম্বলিত, তেল কালী ভূষিত কুচকুচে কাল হিন্দু-স্থানী মূর্ত্তি আবির্ভূত হইল। সাধারণের প্রবেশ অধিকার বর্জ্জিত, এই দ্বিতলের উপর অকস্মাৎ এই চির অপরিচিত অভিনব মূর্ত্তির আবির্ভাব দেখিয়া আমি চম্‌কাইয়া উঠিলাম! কিন্তু বিস্ময় প্রকাশের অবসর হইল না, হিন্দুস্থানী-প্রবর চক্ষের নিমেষে এক লাফে ঘরে ঢুকিয়া পলায়ন-তৎপর ত্র্যম্বকের পথ আটকাইয়া বীরদর্পে লাঠি ঠুকিয়া উগ্র চীৎকারে ধমক হানিল :—

"আরে, রহ, শ্বশুরা, রঃ ; ভাগো কাঁহে ! মেরা বেটিকো সাদি করকে আব্ ইঁয়া আকে ছিপায় থা, কাঁহারে বাউরা ছুছুন্দার্। হাম তেরে প্যাকড়ানে বাস্তে ওয়ারিন্ লায়া,—চল্ শ্বশুরা চল্!" সঙ্গে সঙ্গে ত্র্যম্বকের ঘাড় ধরিয়া সে দিব্য এক মধুর মোহন গলাধাক্কা দান করিল।

বেচারা ত্র্যম্বক পড়িতে পড়িতে সামলাইয়া লইয়া শশব্যস্তে বলিল, "আঃ দেখছেন, সূর্য্য-কা, দেখছেন, এ কি উৎপাত বলুন দেখি।"

সূর্য্যপ্রকাশ যেন এইটুকুরই অপেক্ষায় ছিল! তৎক্ষণাৎ উঠিয়া হিন্দুস্থানী প্রবরের সামনে যোড়হাতে দাঁড়াইয়া সসম্ভ্রমে বলিল, "আরে সবুর সবুর, পয়েণ্টস্ ম্যান্জী, তোমার রেল কোম্পানীর দোহাই দিচ্ছি দাদা.—সবুর! মাথা ঠাণ্ডা করো! বলি তোমার নামটি কি ?—"

হিন্দুস্থানী বীর, ঝব্বা ঝুলাইয়া, গজেন্দ্র-গমনে হেলিয়া দুলিয়া, দু পা পিছু হটিয়া, চার পা আগাইয়া গোঁফে চাড়া লাগাইয়া বলিল "মেরা নাম,—দু-ল্-কী বা-হার! তোম্‌রা ভাতিজা তাম্বাকু দাস বাবু, মেরা

দামাদ্ হ্যায় জী, ই বদমাস্ ছুছুন্দার মেরা বেটিকো সাদি কর্‌কে পিছে—"

ত্র্যম্বক অধীর হইয়া গর্জ্জনে বলিল "ভাখো, ভাল হবে না বল্‌ছি—"

বাধা দিয়া সূর্য্যপ্রকাশ মোলায়েম স্বরে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "আহা তুমি থাম ত্র্যম্বক, তুমি চুপ করো, আমায় কথা কইতে দাও। বলি হ্যাঁগো, ঝুল্‌কী বাহার মশাই,—তোমার জামাই বাবাজীকে তো পাকড়াও করতে এসেছো বেশ, মোদ্দা ওয়ারেণ্ট ফোয়ারেণ্ট একটা কিছু দেখাও দাদা, অগ্নি তো ছাড়তে পারিনে ছেলেটাকে। হাজার হোক্ নাবালক ছেলে না বুঝে যদি একটা কাজই করে ফেলে থাকে,— আমরা পাঁচজন তার জন্যে—অবশ্যি—" হঠাৎ বিষম্ খাইয়া সূর্য্যপ্রকাশ কাশিতে কাশিতে অস্থির হইয়া পড়িল। কথা আর বাহির হইল না। অর্থাৎ তারপর কি বানাইয়া বলিতে হইবে, সেটা খুঁজিয়া পাইল না।

সূর্য্যপ্রকাশের শোচনীয় অবস্থা-বিপর্য্যয়ে দৃক্‌পাত মাত্র না করিয়া, নিষ্ঠুর-চেতা হিন্দুস্থানী বীর, নীরেট-

বীরত্ব আস্ফালনে লম্ফ ঝম্ফ করিয়া লাঠি ঠুকিয়া, অনাবশ্যক উচ্চনাদে চীৎকার করিয়া বলিল "ওয়ারীণ্ দেখ্নে মাংতে? ওয়ারীণ্? আবি ওয়ারীণ্ লায়েঙ্গে, —এ লছমনিয়া, লছমনিয়া—!"

ত্র্যম্বক এতক্ষণ আমাদের সামনে লজ্জার দায়ে পড়িয়া চুপ চাপ দাঁড়াইয়া, রাগে ক্ষোভে মর্ম্মে মর্ম্মে ফুলিতেছিল,—এবার লছমনিয়ার নাম শুনিয়া হাসি সামলাইতে পারিল না। অপ্রস্তুত ভাবে একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া বলিল "বেশ বাবা বেশ! 'একা রামে রক্ষা নাই, সুগ্রীব দোসর?' নাঃ, বাস্তবিক, উপদ্রব তুমি কি ছেলে ভাই? বাপ্,—সাংঘাতিক! দেখছেন্ পিসিমা দেখুন,—" আমার দিকে চাহিয়া কথাটা শেষ করিয়াই,—ত্র্যম্বক বাবাজী, সূর্য্যপ্রকাশের প্রচ্ছন্ন-কৌতুক-হাস্যোজ্জ্বল সুগম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া সলজ্জ হাসিমাখা মুখে পুনশ্চ বলিল, "সত্যি সূর্য্য-কা, আপনারা আচ্ছা লোক মশাই,—আমি অবাক্ হয়ে গেছি, যাহোক বাবা!"

ঘরের বাহিরে বারেণ্ডায়, ছোট পায়ের ঘোড়তোলা

জুতার দ্রুত দৌড়ের আওয়াজ পাওয়া গেল! সঙ্গে সঙ্গে এক যোড়া ঘুঙুর পরা চরণের দ্রুত আগমন শব্দ হইল—ঝুম্, ঝুম্,—ঝুম্!—

আমরা উৎসুক দৃষ্টিতে সেইদিকে চাহিলাম।

(তিনে—নেত্র)

ত্র্যম্বকের অব্যবহিত কনিষ্ঠ সহোদর উপদ্রব চন্দ্রের প্রধান শিষ্য, স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকারী ছাত্র,—বাড়ীর ধড়িবাজের-ধাড়ী, সেরা-ধূর্ত্ত ছেলে, শ্রীমান্ শম্ভুনাথ বাবাজী উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে ঘরে ঢুকিয়া রক্তমুখে হাঁপাইতে হাঁপাইতে সংবাদ জ্ঞাপন করিল,—"পিসিমা, পিসিমা, আপনাদের পুত্রবধূ, পূজনীয়া লছমনিয়া দেবী, হঠাৎ সশরীরে আবির্ভূত হয়েছেন !—"

আমি হাসি সামলাইবার জন্য দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া বলিলাম "শুভ, শুভ !—আমি এখনি পুত্রবধূকে বরণ করে ঘরে তুল্‌তে প্রস্তুত !—"

দাদার হাতের নাগাল এড়াইয়া সাবধানে আমার টেবিলের আড়ালে আশ্রয় লইয়া, অসমসাহসী শম্ভু বাবাজী নির্ভীক প্রাণে প্রশ্ন করিল, "তাহলে পিসিমা, আমি এবার বুক ঠুকে বিয়ের পদ্য লিখ্‌তে সুরু দিই ?—কি বলুন সূর্য্য-কা ?"

বলা বাহুল্য সূর্য্যপ্রকাশ তৎক্ষণাৎ মহাউৎসাহে ঘাড় নাড়িয়া, তাড়াতাড়ি দোয়াত কলম কাগজ লইয়া শম্ভু বাবাজীর হাতের কাছে আগাইয়া দিল। ত্র্যম্বক এতক্ষণ হতবুদ্ধি-বিস্মিত হইয়া, ফ্যাল্ ফ্যাল্ চক্ষে চাহিয়া শম্ভুর ভাব গতিক লক্ষ্য করিতেছিল; এইবার সে বেচারা 'মোরিয়া' হইয়া, দাদা-জনোচিত কর্ত্তৃত্বের সহিত স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া ধীরে বলিল "ভ্যাখ্ শম্ভু, ভালমুখে বল্‌ছি, 'Take care' !"

শম্ভু তৎক্ষণাৎ বৈজ্ঞানিক-তথ্যানুসন্ধানী, বিজ্ঞের মত মাথা চুলকাইয়া, গম্ভীর মুখে দীর্ঘচ্ছন্দে বিশ্লেষণ জুড়িলেন :—"Take care'—অর্থাৎ কি না, 'লও যত্ন !—অতএব তার অন্বার্থ হলো গে কি ? না যত্ন লও। অর্থাৎ কি না বিয়ের কবিতা যেটা লিখ্‌ছ, সেটা

যত্ন করে লেখ! আচ্ছা তা-হবে, সেজন্য ভাবনা নাই!—"

এই অপূর্ব্ব গবেষণাময়ী ব্যাখ্যা শুনিয়া ত্র্যম্বক বেচারী হাসিয়া ফেলিল! এবং সেই হাসিটা ধরা পড়ায় আমাদের দিকে চাহিয়া অধিকতর অপ্রস্তুত হইয়া দাঁতে ঠোঁট কামড়াইতে কামড়াইতে বলিল "আহা হা! কি কি কথাই বল্লেন! আমার গা-টা জুড়িয়ে 'জ—ল্' হয়ে গেল আর কি!—"

লাঠি ঘাড়ে করিয়া, ত্র্যম্বকের পলায়ন-পথের প্রহরায় অবস্থিত, মান্যবর শ্রীযুক্ত হুল্কী বাহার মহাশয়ের দিকে চাহিয়া, শম্ভু বাবাজী তৎক্ষণাৎ ইঙ্গিত-সূচক চক্ষুভঙ্গী করিয়া বিদ্রূপ-ব্যঞ্জক স্বরে বলিল, "শুনুন্, হুল্কী-বাহার মশাই! এর বেলায় গাটা জুড়িয়ে 'জ—ল্' হয়ে গেল! বুঝছেন পয়েণ্টস্ ম্যানজী, কেমন চমৎকার Point-out!"

হুলকী-বাহার মহাশয় টিক্‌টিকির মত টুক্‌টুক্, করিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "হাঁ হাঁ, সে হামি সম্‌ঝাতে পারূছে, সম্‌ঝাতে পারূছে! ঠিক হ্যায়, ঠিক্ হ্যায়!"

শম্ভু বাবাজী চচ্চর শব্দে কবিতা লিখিতে লিখিতে টিপ্পনি কাটিয়া বলিলেন "ঠিক হ্যায় বলে ঠিক হ্যায়! সমস্তই একদম ঠিক্—ঠিক্—ঠিক্ হ্যায়! শুনুন্ পিসিমা, আপনি এখন আমার কবিতা শুনুন, লছমনিয়ার রূপ-বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখছি :—

"কি বলব তাঁর রূপের কথা, বলতে লজ্জা করে।
অন্ধকারে দেখ্‌লে মানুষ, মূর্চ্ছা হয়ে পড়ে!
তবুও দাদা—"

ত্র্যম্বক বিষম অস্থির হইয়া, ব্যগ্র-আপত্তির সুরে বলিল "ঢ্যাখ শম্ভু, তুই আর জ্বালাস্ নে বাপু, থাম!"

শম্ভু উল্টা সুরে কি একটা প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিল, হঠাৎ দুয়ারের বাহির হইতে ঝুম ঝুম ঘুঙুরের আওয়াজের সঙ্গে, হিন্দুস্থানী বেশ-ভূষায় সজ্জিতা, ঘোমটা-পরা একটি ছোট্ট বালিকা, ক্ষিপ্র লঘুগমনে বিদ্যুতের মত ছুটিয়া আসিয়া, আচম্‌কা ত্র্যম্বকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া, তাহার চিবুক ধরিয়া নাড়া দিয়া, শিশু-সুলভ কলহাস্যে ঘরশুদ্ধ সবাইকে চম্‌কাইয়া দিয়া—ব্যঙ্গস্বরে "ক্যায় চা হ্যায়?"

ত্র্যম্বক হতবুদ্ধি নির্ব্বাক! বিস্ফারিত লোচনে মুহূর্ত্তের জন্য মেয়েটির দিকে চাহিয়া বিস্ময়োত্তেজিত স্বরে বলিল "ক্যায়সা হ্যায়! যা—বাবাঃ! এ আবার কি?"

মেয়েটি ঘোমটা সরাইয়া আলকাতরা মাখা কুচকুচে কাল মুখখানি বাহির করিয়া খিল্ খিল্ হাস্যে বলিল "আমি লছমনিয়া! তুমি আমায় তিন্‌তে পার্‌তা নেই, লছমন্ দাস?"

ত্র্যম্বক অবাক্! সাশ্চর্য্যে বলিল "তুতু? যা হোক বাবা,—উপদ্রব, তোমার চরণে নমস্কার মশাই!"

কাশির ধমকে হাসি আড়াল করিয়া ঢুল্‌কী বাহার মহাশয়, লছমনিয়া ঠাকুরাণীর হাত ধরিয়া বলিলেন "লেও বাবুজী, মেরে ওয়ারীন্ দেখ্ লেও, আব্ মেরে দামাদ্ কো ছোড়্ দেজিয়ে।"

হাসির চোটে সূর্য্যপ্রকাশ বেচারীর চোখে জল বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। কোন মতে আত্মসম্বরণ করিয়া, চোখ মুছিতে মুছিতে, রীতিমত কান্নার উচ্ছ্বাসে, ফোঁশ ফোঁশ করিতে করিতে, শোক বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি উত্তর দিলেন "নিয়ে যাও দাদা, আর না ছাড়লে

আমাদের উপায় কি? হায়, হায়, ত্র্যম্বক, এমন কাজও কর্‌লি বাবা,—শেষ পর্য্যন্ত আমাদের কাঁদিয়ে ছাড়্‌লি!—"

"সালাম্ বাবুজী, বহুৎ বহুৎ সালাম্।" বলিয়া হুন্‌কী বাহার মহাশয় ফিরিয়া ত্র্যম্বকের ঘাড় ধরিয়া বলিলেন "চল্ শ্বশুরা, আবি তুকো গর্দ্দানা দেকে, লে যাঙ্গে চল্!"

"সবুর্"—বলিয়া শম্ভু বাবাজী কবিতার কাগজ হাতে এক লাফে লছমনিয়ার সামনে উপস্থিত হইয়া হাত মুখ নাড়িয়া, সপদদাপে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বীরদর্পে বক্তৃতা সুরু করিলেন :—"এই লছমনিয়া,—

তুম, ছাতু খাও, আর যো খাও,

মেরা দাদাকো খিলায়ো ভাত!

কারণ—ভাত না খানেসে, তিন রোজ মে দাদা আমার

হো যাগা চিৎপাত!—"

সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভক্তিভরে হেঁট হইয়া লছমনিয়ার পদপ্রান্তে ভূমিষ্ঠ প্রণাম নিবেদন করিলেন।

"মাপ কর্ব্বেন পিসিমা,—এবার—" বলিয়াই হঠাৎ

ত্র্যম্বক বাবাজী তড়াক্ করিয়া উঠিয়া, ভূমিষ্ঠ-শির শম্ভুর ঘাড়ে অতর্কিতে 'ক্যাৎ' করিয়া এক লাথি ঝাড়িয়া প্রসন্ন-বিনয়ে বলিলেন—"আর কবিবরের কবিত্বের পুরস্কার এই—পদাঘাত !"

আমরা হাঁ হাঁ করিয়া উঠিতে উঠিতে,—বেচারা শম্ভু কুষ্মাণ্ডবৎ গড়াইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে ত্র্যম্বক, বাধাদানোদ্যত ডুল্‌কী বাহারের মাথার পাগড়ীটা এক চপেটাঘাতে দুয়ারের বাহিরে উড়াইয়া দিয়া,—এক টানে দাড়ি গোঁফ সমূলে ছিড়িয়া লইয়া,–তিন লাফে ঘর ছাড়িয়া, বারেণ্ডা পার হইয়া অন্তর্দ্ধান করিল !

শম্ভুকে উঠাইয়া, গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া, সস্নেহে ঘাড়ে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিলাম "কিছু মনে কোর না বাবা, এবার আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—ক্যায়সা হুয়া ?"

সকরুণ মুখে শম্ভু উত্তর দিল "উঃ, চমৎকার।"

দাড়ি গোঁফ অপহৃত মুখের তেল কালী সাফ করিতে করিতে ডুলকী বাহার—ওরফে শ্রীমান উপদ্রব-চন্দ্র ততোধিক সকরুণ মুখে বলিলে "দাড়ি গোঁফটার

সূতা কাণের সঙ্গে আটকে রেখেছিলুম ভাই,—বুড়বাক্ 'শ্বশুরটা' সেদিকে খেয়াল না করেই, নির্দ্দয় বিক্রমে এইসা টান মেরেছে, যে, আমার কাণ-দুটো শুদ্ধ জখম হয়ে গেছে।”

লছমনিয়া দেবী তখন ওড়না ঘাঘরা ঘুঙুর খুলিয়া ফ্রক, পাজামার স্বরূপে প্রতিষ্ঠিতা হইয়া, সূর্য্য-কাকাকে ধরিয়া মুখের আল্‌কাৎরা পরিষ্কার করাইতে করাইতে রগড়ানির চোটে উষ্ণ-চিত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন।— উপদ্রবের কথা শুনিয়া, উত্তেজিত ভাবে মুখ ফিরাইয়া, সদর্পে হাতে হাত পিটিয়া বলিলেন, “পেচ হয়েছে, চুব হয়েছে!—এ বিয়েল্ এই মস্তোল্! তোমাল্ কাণ-দুটো যদি 'চম্পকদা' একেবালে ছিলে নিতে পাত্তো, তবে, আমাল্ মনে চুব চুখ হোত!—আমি বল্লুম, এত 'আল্‌তাক্‌লা' মাখবো না, তবু মাখিয়ে দিলে, দ্যাখো দেখি পিচিমা!—”

তুতুর স্বর অনুযোগের অভিমানে কান্নায় ভরিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া, আমি ব্যস্ত লইয়া তাড়াতাড়ি টেবিলের উপর হইতে ভারী সীসার

পেপার প্ল্যাস্‌টা তুলিয়া লইয়া বলিলাম "বাস্তবিক, ত্র্যম্বকের বড় অবিচার!—এ বেচারা অনেক আল্‌কাৎরা মেখেছে, সেই জন্যে শম্ভু আর উপদ্রবের সঙ্গে একেও, কিছু মোটা পুরস্কার দেওয়া ত্র্যম্বকের উচিত ছিল। যাই হোক সূর্য্য, তুমি ভাই এটায় গর্ত্ত করে একটা দড়ি পরিয়ে, ওর গলায় মেডেল ঝুলিয়ে দাও!—চমৎকার মানাবে।"

দড়াদ্দম্ -দড়াদ্দম্ শব্দে, একটা ক্যানেস্তারা পিটাইতে পিটাইতে, উপদ্রবের অন্যতম সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র, শ্রীমান্ উৎপাতচন্দ্র ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "এবার, 'হরি হরি বল সবে পালা হোল সায়!—কাকা-ভাই, পুষ্পাঞ্জলি দেবার সময় হয়েছে, এবার চটপট্ স্নান করে কাপড় পরে নাও, শম্ভু দা আর তুতু, তোমরাও ঝেড়ে ঝুড়ে উঠে পড়ো। - পিসিমাকে ছুটি দাও এবার।"

এতক্ষণের পর প্রসন্ন তৃপ্তির সঙ্গে সুদীর্ঘ আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম, "এসো, বাপ আমার, এসো। সর্ব্ব উৎপাত-বিনাশক মন্ত্র উচ্চারণ করে মুক্তিদাতা, পরিত্রাতা উৎপাতচন্দ্র,—এতক্ষণের পর তুমিই এসে

আমার যথার্থ বাবার উপযুক্ত কাজ কর্‌লে, তোমার মঙ্গল হোক্। এসো একটা চুমো দাও,—বাবা। স্বস্তি!—”

বিজয়ার নমস্কার

ভাদ্র মাস। সমস্ত দিনের বৃষ্টির পর, সন্ধ্যায় সেই-সবে বর্ষণ বন্ধ হইয়াছে। ধোঁয়ায় চোখ জ্বলিয়া যাইতেছিল। আধ-জল্‌সানো ভিজে কাঠে উপর্য্যুপরি ফুঁ দিতে দিতে, ব্যথা ক্লান্ত হইয়া পড়িল। অশ্রু-সজল চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল,"ঝি, খান কতক শুক্ন ঘুটে এনে দাও না।"

রান্না ঘরের দুয়ারের বাহিরে বসিয়া ঝি তন্দ্রার ঝোঁকে ঝিমাইতেছিল। অনুরোধ শুনিয়া বিরক্তস্বরে বলিল, "এই বর্ষার দিনে শুকনো ঘুঁটে পথে বসে কাঁদ্‌চে! গরজ থাকে, খুঁজে নাও গে।"

"অগত্যা।—"বলিয়া ব্যথা উঠিল। ঝির সাম্‌নে হইতে হ্যারিকেনটা তুলিয়া লইয়া উঠানের ওপাশে

কয়লার ঘরে যাইতে যাইতে বলিল, "বেরালে যেন দুধ না খায় ঝি, একটু দেখো।"

দ্বিতলের বারেণ্ডা হইতে চাকর হাঁক দিল, "গরম জল গাড়ী দিয়ে যাও বেতাদি।"

দ্বিতলের হল ঘর হইতে মেজবাবু তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "কেন? তুমি যেয়ে আন্‌তে পার না, নবাব পুত্তুর!"

ব্যথা শুনিল, একটু ম্লান হাসি হাসিল! কয়লার ঘরে ঢুকিয়া এদিক ওদিক খুঁজিয়া একটা ভাঙ্গা ঝুড়ি হইতে বাছিয়া বাছিয়া খান চার শুক্‌নো ঘুটে লইয়া তাড়াতাড়ি ফিরিল। বিপুল উৎসাহে আবার উনান জ্বালিতে বসিল।

চাকরটি দুম্ দুম্ শব্দে রান্নাঘরের দুয়ারের কাছে আসিয়া ঝাঁঝিয়া বলিল, "জল দাও!'

"দিই বাপু, দাঁড়াও।'

চাকর ধমকাইয়া বলিল, "এখনো হয় নি? কি কর-ছিলে অতক্ষণ?"

"নাকে তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছিলুম। দ্যাখ পাহাড়ি,

আমার ধমক দিবার ঢের লোক আছে। তুমি আর বোঝার উপর শাকের আঁটি চাপিও না বাপু।"

পাহাড়ী বড়বাবুর আদরের চাকর। বাড়ীর বাবু কয়টী ও তাঁহাদের গৃহিণী কয়টী ছাড়া আর কাহাকেও 'মনুষ্য জ্ঞান' করিয়া চলা, তার কোষ্ঠিতে লেখা নাই। ব্যথার কথা শেষ হইতে না হইতে রুখিয়া বলিল, "কিসের —'শাকের আটি,' বল ত? 'ইষ্টুভ' জ্বেলে জল গরম কর্ত্তে বললে,—ওদিকে বড়-মা আমায় বারুণ কর্‌লেন,—ইসপিরিট খরচ করিস্ নি। আমি কি করব বল ত? মুনিবের কথা রাখব, না চাকরের কথা শুনব?"

ব্যথা নিরুত্তর রহিল। অন্নদাসত্বের পায়ে মাথা বিকাইয়া চলা ভিন্ন যাহাদের অন্য গতি নাই,—আত্মীয় অভিমানে 'মানের কান্না কাঁদিতে বসা' তাহাদের সাজে না। বাড়ীর ঝি, চাকরদের অবহেলা,—এমন কি অপমান-গুলাও নিঃশব্দে তাহাদের সহ্য করা চাই! রাগিয়া প্রতিবাদ করা? ফল কি? যাহাদের অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, অনাত্মীয়ের আশ্রয়ে আশ্রয়লাভ করিবার অধিকার পর্য্যন্ত নাই, অন্যায্য অপমানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার শক্তি

তাহাদের কই? এই ঝি চাকরগুলা নিশ্চিত জানে, স্বাধীনতা ও পদমর্য্যাদায় তাহারা প্রভু গোষ্ঠীর আশ্রিতা এই ব্যথার চেয়ে উচ্চ জীব। আজ এ বাড়ী ছাড়িলে কাল তাহারা অন্যত্র চাকরী জুটাইবে। কিন্তু ব্যথার এই অর্থহীন—অর্থাৎ নগদ মুদ্রাহীন, আত্মীয়-সম্পর্কের অন্ন-দাসত্ব, এটার নড় চড় হইবার যো নাই। প্রভুরা অবশ্য খুসী হইলে আশ্রিতাকে গলা ধাক্কা দিয়া তাড়াইতে পারেন, কিন্তু ব্যথার পক্ষে নিজ হইতে নিজের পথ দেখিবার ক্ষমতা নাই। কারণ, বাংলা মুল্লুকের মেয়ের পক্ষে তাতেই জাতি নাশ অনিবার্য্য। এদেশের প্রত্যেক মেয়ের জাতি—শুধু পরের রসনার অনুগ্রহ ও নিগ্রহের উপর নির্ভর করে বই ত নয়? সুতরাং যে কোন মুহূর্ত্তে হউক,—যাইলেই হইল! ও জিনিষটা যাইবার পক্ষে পয়সা কড়ির খরচও নাই,—বিচার, বিবেচনার আব-শ্যকও নাই। রাজ-বিচারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীর গলায় ফাঁসির দড়ি পরাইবার সময় জল্লাদকেও একবার রাজার দোহাই দিতে হয়! কিন্তু এদেশের মেয়েদের জাতি-চ্যুত করিবার সময় সে সব কোন বালাই নাই।

কারুর দোহাই ত নয়ই, কাউকে একটা কৈফিয়ত দিবার আবশ্যকতাও নাই! সুতরাং বিশেষ সুবিধাজনক ব্যাপার! অতএব তাহাকে যা খুসী, স্বচ্ছন্দেই বলা চলে।

ব্যথাকে নীরব দেখিয়া পাহাড়ী কি ভাবিল, কে জানে। একটু থামিয়া, সংযত স্বরে বলিল, "বাজারের হিসেবটা এখন লিখবে?"

ব্যথা সংক্ষেপে বলিল, "অপর কাউকে দিয়ে লেখাও গে।"

চাকর নরম সুরে বলিল, "কে লিখবে? বড়-মা, মেজ-মা, পিসি-মা সবাই তাস খেল্‌চেন। ওরা কি কেউ লেখে কোন দিন?"

অতএব অন্নদাস বলিয়া ব্যথাই একা চোরদায়ে ধরা পড়িয়াছে! বাড়ীর সকলের সমস্ত ফরমাস তাহাকে খাটিতে হইবে,—গৃহস্থালীর সকল দিক দেখিতে হইবে, বামুনের অনুপস্থিতে বৃহৎ পরিবারের রন্ধন পরিবেশনের ভার লইতে হইবে। তারপর বাড়ীর যে ঝি চাকর যখন যে কাজে অনুপস্থিত থাকিবে,—তার অধিকাংশ কাজেই ব্যথার ডাক পড়িবে। অথচ ব্যথার জন্য যে কর্ত্তব্যগুলা

নির্দ্দিষ্ট আছে, ব্যথা হাজার কাজে যোড়া থাকিলেও—কেউ সেগুলার একটাতেও হাত দিবে না। যতক্ষণে ব্যথা ছুটি পাইবে, ততক্ষণে আসিয়া সে সব কায সারিবে। কেন না, বাড়ীর অন্য সকলের অবস্থার সঙ্গে ব্যথার অবস্থার পার্থক্য অনেক।—সে উপায়হীনা! সে পরনির্ভরশীলা! ইহাদের অনুগ্রহ—তা সে যত বড় নিগ্রহ অত্যাচারে পূর্ণ হউক না কেন,—সেই অনুগ্রহ ছাড়া আজ এ পৃথিবীতে ব্যথার দাঁড়াইবার স্থান নাই।

বিদ্যুচ্চমকের মতই নিজের অবস্থা-স্মৃতি ব্যথার মনে পড়িল! নিজের অজ্ঞাতেই ব্যথা করুণ হাসি হাসিল! ভিক্ষা এবং অনুগ্রহের দান ভিন্ন, যাহার বাঁচিবার উপায় নাই,—ধর্ম্ম হউক, সমাজ হউক, লোকাচার হউক, বা স্বয়ং অদৃষ্টই হউক, যাহাদের নিজ শক্তিতে অন্ন সংগ্রহের পথগুলা বন্ধ করিয়া দিয়াছে, তাহাদের পক্ষে,—'লাথি ঝাঁটা খাইয়া "চুপটি করিয়া" ঘৃণিত জীবন যাপনই' পরম নিরাপদ। আশ্রয়দাতার দাসদাসীর কটূক্তিতে রাগ করা, ব্যথার অবস্থার পক্ষে লজ্জা ও মূর্খতার বিষয়!

নিজেকে সামলাইয়া, ব্যথা মৃদুস্বরে বলিল—"সকলের

খাওয়া হলে তবে আমি ছুটি পাব। তখন আমি লিখব। সাড়ে সাত টাকার বাজার খরচ, এক মিনিটে লেখা হবে না ত? জল নিয়ে যাও।”

চাকর অপ্রসন্ন ভাবে বলিল—“হিসেব লেখা না হলে আমি ছুটি পাই না। ওদিকে বড়বাবু ছোটবাবু সবাই পা টেপবার জন্যে হাঁকাহাঁকি করেন। আমার পরাণটা গেল!—”

ব্যথা এবার সত্যসত্যই রাগ ভুলিল। সহানুভূতি-করুণ কণ্ঠে বলিল “কি করব বাবা? আমার দুটো ছাড়া হাত নেই, আর হেঁসেলের কাজেই এখন এ দুটো যুড়ে রাখতে হয়েছে। হিসেব লিখি কি করে?”

“সেই ত—“বলিয়া চাকর গরম জল লইয়া প্রস্থান করিল। ব্যথা ঝোল তরকারী ঢাকা দিয়া হেঁসেল গুছাইতে লাগিল।

(২)

ঠিক সেই সময়ে বাহিরের উঠান হইতে দ্বারবান হাঁকিল,—"ঝি বাহার আসো। কোন্ মায়ি আসছে, ইন্‌কো অন্দরমে লিয়ে যাও!"

সুখ-তন্দ্রার ব্যাঘাতে ঝি খুসী হইতে পারিল না। কিন্তু বড়লোক মনিবদের অতিথি কুটুম্বিনীদের সসম্মান অভ্যর্থনা না করিলে, উপায় নাই। চোখ মুছিতে মুছিতে সে বাহিরের দিকে ছুটিল।

মিনিট পাঁচ পরেই ব্যথা শুনিল, বাহিরে কোন এক অপরিচিত নারী কণ্ঠের কি একটা অস্পষ্ট প্রশ্নের উত্তরে ঝি উগ্র বিরক্তি ভরে ঝঙ্কার দিতেছে,—"বোথা দেবী আবার কে? বোথা টোথা এখানে কেউ নাই।"

অপরিচিত নারীকণ্ঠে সবিস্ময়ে প্রশ্ন হইল "সে কি? এই ত এ্যাটর্ণী ত্রৈলোক্য বাবুর বাড়ী?"

"হেঁ! তা বলে বোথা দেবী এখানে কে আছে?"

"ব্যথা দেবী! এখানে থাকেন না তিনি?"

"না গো বাছা, না। এখানে বোথা দেবী নাই!"

ব্যথাকে খোঁজে কে? ব্যথা আশ্চর্য্য হইল! চট করিয়া হাত ধুইয়া বাহিরে আসিল। দেখিল, অনাড়ম্বর শুভ্র-পরিচ্ছদ-ভূষিতা এক প্রৌঢ়া ভদ্র-মহিলা। তাঁহার চোখে সোণার চসমা, পায়ে জুতা। সঙ্গে এক দাসী।

ব্যথা নমস্কার করিয়া বলিল, "কাকে খুঁজছেন?"

"ব্যথা দেবীকে! তিনি কি এই বাড়ীতে—?"

"কোথেকে আসছেন?"

"আনন্দ-পত্রিকা অফিস থেকে।"

ব্যথা ব্যথিত ভাবে ঈষৎ হাসিল। ঝির দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি দয়া করে রান্না ঘরটায় বোস গে। কেউ খেতে এলে আমায় ডেকে দিও।—"

মহিলাটির দিকে চাহিয়া বলিল "নমস্কার! এদিকে আসুন।"

মহিলাটি প্রতি-নমস্কার করিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ব্যথার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ব্যথা দেবী কই ?"

"আসুন, পরিচয় দিচ্ছি।"

"আপনি কি ?—" তিনি উৎসুক দৃষ্টিতে ব্যথার দিকে চাহিলেন।

ঈষৎ সন্ত্রস্ত হইয়া ব্যথা বলিল "আসুন।"

রান্নাঘরের অদূরে ভাঁড়ার ঘরের পাশে একটা ঘর ছিল। স্বল্প পরিসর ক্ষুদ্র ঘর। একটা তক্তপোষেই যেন সমস্ত ঘরটা জুড়িয়া গিয়াছে। তক্তপোষের উপর এক-খানি ছোট সতরঞ্চি ও আধ-ময়লা চাদর, আধ-ময়লা ওয়াড় পরানো একটা বালিশ এক প্রান্তে পড়িয়া আছে। একটা অল্প দামের মশারি দেয়ালের ব্রেকের উপর ভর দিয়া কষ্টে স্বষ্টে ঝুলিতেছে। ঘরের এক কোণে দেব-দারু কাঠের একটি বাক্সের পিঠে একটা ট্রাঙ্ক। ট্রাঙ্কের উপর এক গোছা খবরের কাগজ সুবিন্যস্তরূপে পাতিয়া, তার উপর খান দুই চার বহি ও দোয়াত কলম সাজান রহিয়াছে। সম্ভবতঃ দেবদারু কাঠের বাক্সে বসিয়া সময়ে সময়ে ট্রাঙ্ককে লেখা-পড়ার টেবিলরূপে ব্যবহার

হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র ঘরটির মাঝে, দৈন্যের সঙ্গে যেন একটি শান্ত-শৃঙ্খলা বিরাজ করিতেছে।

চকিত দৃষ্টিতে গৃহের সমস্ত অবস্থা দেখিয়া মহিলাটি সসঙ্কোচে বলিলেন "এটি আপনার ঘর ?"

একটু হাসিয়া ব্যথা বলিল "অস্থায়ী আড্ডা। এই তক্তপোষে বসুন।"

মহিলাটি বসিলেন। তাঁহার দাসী দুয়ারের বাহিরে দেয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া পড়িল। ব্যথা দেবদারু কাঠের বাক্সটির উপর বসিল।

মহিলাটি স্মিত মুখে বলিলেন "পৃথিবীর আড্ডাটা আমাদের সকলকারই অস্থায়ী ; কিন্তু বিনা-খবরে হঠাৎ এসে আপনাকে বিরক্ত করে তুললুম, মাপ করবেন—"

"মাপ করুন, বিরক্ত হওয়ার ফুরসুৎ আমার একটুও নেই, চব্বিশ ঘণ্টাই নানা কাজ! আপনার দরকার কি জিজ্ঞাসা করতে পারি ?—" ব্যথা হাসি হাসি মুখে মহিলাটির দিকে চাহিয়া বলিল "আপনি আমার চেয়ে বয়সে বড়। আপনাকে দিদি বলে ডাক্‌লে আপনি অপরাধ নেবেন না ত' ?"

"না। সৌভাগ্য বোধ করব। আপনার হাসির কবিতাগুলি খুব জনপ্রিয় হয়ে পড়েছে। পত্রিকার তরফ থেকে তাই অনুরোধ করতে এসেছি, এই রকম কবিতা অনুগ্রহ করে মাঝে মাঝে দিতে হবে।"

"অবসর পাই ত' চেষ্টা করে দেখব। আমার সময় বড্ড কম।"

"কি কি কাজে আপনাকে ব্যস্ত থাক্‌তে হয়, জান্‌তে পারি ?"

"গৃহস্থালীর ব্যাপার।"

"আর ?"

ঈষৎ হাসিয়া ব্যথা বলিল "গৃহস্থালী ব্যাপারের পর 'আর' বল্‌বার মত কিছু বাঙালীর মেয়ের জীবনে আছে না কি ? অন্ততঃ আমার জীবনে ত নাই।"

"ত্রৈলোক্য বাবু আপনার কে হন ?"

"কেউ নন। খুব দূর একটা সম্পর্ক আছে মাত্র। আস্‌লে আমি এঁদের একটা আশ্রিতা গলগ্রহ মাত্র।"

"তাই না কি ? আমরা আপনার সম্বন্ধে অন্যরকম ধারণা করেছিলুম।"

জোর নিশ্বাস ছাড়িয়া ব্যথা ম্লান হাস্তে বলিল, “পরের সম্বন্ধে যথেচ্ছ ধারণাটা কল্পনা কর্ত্তে আমরা সবাই অসম সাহসী। আচ্ছা, আজ তবে,—”

ইঙ্গিত বুঝিয়া মহিলাটি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন “আপনি বড় ব্যস্ত আছেন দেখছি। আমার বাড়ীতে অনুগ্রহ করে আসছে রবিবারে একবার পায়ের ধূলো দিতে রাজি আছেন ?”

বিব্রত হইয়া ব্যথা বলিল “আমি ততটা স্বাধীন নই।”

ঠিক সেই সময়ে রান্না ঘর হইতে ঝি ঝঙ্কার দিয়া বলিল “বলি, অ-ভালমানুষের মেয়ে! হ্যান্‌ঠোন নিয়ে যে ঘরে ঢুক্‌লে, সারারাত গপ্পই করবে না কি ? এদিকে বারান্দায় যে আঁধারে নোকগুণো হোঁচট খেয়ে মরছে।”

ব্যথা যারপর নাই ব্যস্ত হইয়া বলিল, “আসুন। আর আমার দাঁড়াবার সময় নেই। আপনি কিছু মনে করবেন না। অন্ন-বস্ত্রের জন্য যাদের পরমুখাপেক্ষী হ’য়ে থাক্‌তে হয়, তাদের পক্ষে সৌজন্য শিষ্টতার নিয়ম মেনে চল্‌বার সৌভাগ্য নেই। আমার অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্যে আমি ক্ষমাভিক্ষা করছি।”

মহিলাটি অনেকখানিই অপ্রস্তুত—এবং বোধ হয় কতকটা হতবুদ্ধি হইয়াই পড়িয়াছিলেন। ত্রস্তে বলিলেন, "না—না, ক্ষমা চাওয়ার কোন দরকার নাই, আমায় লজ্জা দেওয়া হয় মাত্র। কিন্তু আশ্চর্য্য হচ্ছি, এই সব ভিড়ের মাঝে বসে, আপনি কখন হাসির কবিতা লেখেন? রচনা আসেই বা কি করে?"

চলিতে চলিতে স্নিগ্ধ হাস্তে ব্যথা বলিল, "তা জানিনে! জানবার সময়ও বড় একটা পাইনে। নিজের কাগজ কলমের দুঃসাহসিক স্পর্দ্ধা দেখে নিজেরো সময় সময় একটু আশ্চয্য লাগে বটে, কিন্তু কোথেকে কি যে হচ্ছে, কিছুই বুঝতে পারিনে।"

"লেখেন কখন?"

"অশ্রান্ত দুঃখ কষ্টের অত্যাচারে মন যখন নেহাৎ অবসাদে ভরে উঠে, তখন।"

"তখন?"

"হাঁ। একঘেয়েমি সহ্য করা যখন শক্ত হয়ে উঠে, তখন আত্ম-বিস্মৃতির এই উপলক্ষগুলা মন্দ লাগে না। সব দিন ঘুম ভাল হয় না। আমার ঘুমটা স্বভাবতঃই

কিছু কাহিল।”—ব্যথা সকৌতুকে হাসিল। বলিল, “সেই সময়ে একটু একটু লিখি। আচ্ছা, আপনার কাজে লাগে ত' পাঠিয়ে দেব।”

জামার ভিতর হইতে একখানি পাঁচ টাকার নোট বাহির করিয়া, মহিলাটি বলিলেন, “আপনার কাগজ কলম ডাকটিকিটের খরচ আছে। কিছু মনে করবেন না, এই সামান্য টাকা কটা তারি জন্যে......। দয়া করে এটুকু নিন।”

বিস্ময়-স্তব্ধ দৃষ্টিতে ব্যথা মহিলাটির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। নোটখানা ব্যথার হাতে গুঁজিয়া দিয়া তিনি বলিলেন, “নমস্কার।”

“নমস্কার। কিন্তু আমার কাগজের দাম এত হবে না।” ব্যথার কণ্ঠস্বর বেদনায় জড়াইয়া উঠিল। মহিলাটি মুহূর্ত্তের জন্য ব্যথার মুখের দিকে চাহিলেন। কি একটা কথা বলিতে উদ্যত হইয়াছিলেন—সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, “নমস্কার। আপনার কাজে যান। দয়া করে কবিতা পাঠাবেন।”

দাসীকে সঙ্গে করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। দু'

মিনিট পরেই বাহিরের ফটক হইতে একখানা ঘোড়ার গাড়ী সশব্দে চলিয়া গেল।

ব্যথা মূঢ়ের মত স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল। রান্না-ঘর হইতে আবার চীৎকার উঠিল, "নেনঠোনটা দিয়ে যাবে, না কি গো?"

ব্যথার সংজ্ঞা ফিরিল। তাড়াতাড়ি ফিরিয়া রান্না-ঘরের রোয়াকে উঠিল। রোয়াকের উপর এক প্রৌঢ়া নারী দাঁড়াইয়া, ঈর্ষাদীপ্ত নয়নে ব্যথার দিকে চাহিয়া ছিলেন। ব্যথা কাছে আসিতেই তীব্র শ্লেষের স্বরে বলিলেন, "ঐ চশমা জুতা পরা উনি কে গা?"

ব্যথা ভয় পাইল। না বলিলে নিস্তার নাই, কিন্তু সত্য বলিলেও পরিত্রাণ নাই। অথচ সত্য প্রকাশ করিলে এখনি বাড়ীতে একটা বিশ্রী রকমের হৈ চৈ গোলমাল যে লাগিয়া যাইবে, এবং চাই কি ব্যথার একমাত্র আশ্রয়টাও যে এখনি হাত ছাড়া হইতে পারে, এ সত্য ব্যথা ভুলিতে পারিল না। ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "আমি চিনি নে।"

"চিননে কি-রকম? এতক্ষণ ধরে হাসি গল্প

হোল,—অত কথা হোল। আবার টাকাও দিলে ত দেখ্‌লুম। টাকা কিসের?"

"ওঁর কতকগুলো কায করে দিতে হবে, তারই টাকা দিয়ে গেলেন। আপনি এখন খাবেন পিসিমা? ভাত বেড়ে দেব?"

বড় পিসিমা পরচর্চ্চা ভুলিয়া গেলেন। আত্ম চিন্তায় বিভোর হইয়া দুশ্চিন্তাব্যঞ্জকস্বরে বলিলেন, "খাবো ত। কিন্তু আমায় ভাত দিয়ে, উপরে গিয়ে ছেলেটিকে ধরবে? আর কারু কাছে ত সে থাক্‌বে না।"

পরিত্রাণ পাইয়া, ব্যথা মহাহর্ষে হাস্যোৎফুল্ল মুখে বলিল, "তার আর কি হয়েছে! আপনি খেতে বসুন, আমি ওপরে গিয়ে খোকাকে নিচ্ছি।"

(৩)

ব্যথার জীবনের অতীত অধ্যায়টি বেশ একটু বৈচিত্র্যে রঞ্জিত। অনেকগুলি ছেলে মেয়ে মারা যাইবার পর ব্যথা যখন বাপ মার এক সন্তানরূপে টিকিয়া গেল, তখন বড় দুঃখ ও আনন্দেই তাঁহারা কন্যার নাম রাখিলেন "ব্যথাহারিণী।"

কিন্তু বেশী দিন সুখ সম্ভোগ সহিল না। পাঁচ বছর বয়সে বাপ এবং দশ বছর বয়সে মা ইহলোক ত্যাগ করিলেন। নিজের আসন্ন মৃত্যু বুঝিয়া মা, সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া ভিটা মাটী বন্ধক দিয়া, বিপুল ব্যয়ে দূর গ্রামে এক বড় গৃহস্থ ঘরে কন্যা সম্প্রদান করিয়া গেলেন। শোনা গেল ঘরটি খুব নামজাদা। সে গৃহে কন্যা দিতে পারিলে, কন্যার না কি অন্নবস্ত্রের অভাব কখনও হইবে না। সুতরাং অন্নবস্ত্রের অভাব যখন নাই, তখন অন্নবস্ত্র দানের কর্ত্তা যিনি, তাঁহার প্রকৃতির পরিচয় লইবার

আবশ্যকতা কি ? বরের সংবাদ কেহ লইল না। মহা আড়ম্বরে 'বড় ঘরে' ব্যথার বিবাহ হইয়া গেল।

মহা আদর যত্ন। বিপুল জাঁক জমকের তত্ত্বতাবাস দেখিয়া শুনিয়া মা খুব স্বস্তিতে মারা গেলেন।

ব্যথা সঙ্গে সঙ্গে শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইল। কিন্তু মাসখানেক যাইতে না যাইতে ব্যথার সুখস্বপ্ন স্বপ্নে পরিণত হইল। ব্যথা দেখিল এই বড় ঘরের বড় বাবু হইতে ছোট বাবু পর্য্যন্ত সকলকারই মেজাজ বিশেষ 'বড়' রকমের। তাঁহাদের মত সধর্ম্মনিষ্ঠ মহাপুণ্যবান এ পৃথিবীতে কেউ নাই বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য এক দিকে তাঁহারা যেমন ঘোরতর ব্যস্ত বিব্রত—অন্যদিকে ব্যভিচার, পরস্বাপহরণ, প্রবঞ্চনা ও সুরা পানে তাহারা তেমনি পরম পটু। অযোগ্যের হাতে পড়িলে অর্থের যে কতদূর দুর্গতি হইতে পারে, তার জাজ্জ্বল্যমান উদাহরণ দিনের পর দিন নিত্য নূতন আকারে দেখিয়া ব্যথা হতবুদ্ধি হইয়া গেল। প্রশ্ন করিয়া জানিল বড়লোকত্ব রক্ষার প্রকৃষ্ট পন্থাই না কি মিথ্যাবাদিতা, অর্থের অসদ্ব্যয় এবং প্রবঞ্চনা !!

ব্যথার পূর্ব্ববর্ত্তী যাতৃগুলি “বড়লোকী” আবহাওয়ার কল্যাণে নিখুঁত ‘বড়লোক’ হইয়া উঠিয়াছিলেন। বাক্য-বৈভবের প্রসাদে গরীব প্রতিবেশী মহলে, তাহারা বিশেষ খ্যাতিপন্না ‘বড়লোক গিন্নি’র সম্মান লাভ করিয়াছেন। কিন্তু অত মিথ্যা বলিতে ব্যথার জিহ্বায় আটকাইত। সে এক পাশে জড় সড় হইয়া, সকলের অবজ্ঞা পাত্রী ‘গোবেচারী’ হইয়া দিন গুজরাণ করিতে লাগিল।

কিসে কি হইল, ব্যথা কিছুই জানে না। হঠাৎ এক দিন শুনিল বাবুদের সকল বৈভবের মূল, বস্ত্রের ব্যবসায়ে না কি আগুন লাগিয়াছে। অন্য অংশীদাররা ইহাদের বিরুদ্ধে জুয়াচুরীর অপবাদ দিয়া কয়েক হাজার টাকার দাবীতে নালিশ করিয়াছে।

তুমুল মামলা চলিল। বিস্তর টাকা খরচ হইল। উকীল মোক্তারদের মধ্যে জন কতক অর্থ পিশাচ না কি ‘সাপ হইয়া কামড়াইয়া রোজা হইয়া ঝাড়িতে’ বসিয়া এক মহা অনর্থ বাধাইয়া দিলেন। মামলা হার হইল।

প্রতিপক্ষের মাথা ফাটাইবেন বলিয়া বাবুরা মহা আস্ফালন করিতে করিতে বাড়ী ঢুকিলেন। তারপর

মামলা ও ব্যবসার কথায় নিজেদের মধ্যে পরস্পরের বুদ্ধি-ত্রুটি উল্লেখে কি যে দু'একটা বচসা হইল, ঠিক বোঝা গেল না,—হঠাৎ ভাইয়ে ভাইয়ে মারামারি সুরু হইয়া গেল। ছোট ভাই এক 'ক্যাচা' আনিয়া ব্যথার স্বামীর কাঁধে আঘাত করিল। ব্যথার স্বামী এক ধারালো' কাটারীর আঘাতে ছোট ভাইয়ের মুণ্ড স্কন্ধচ্যুত করিয়া ফেলিল। বড় ভাই কাটারী কাড়িয়া ব্যথার স্বামীর পা জখম করিয়া দিল।

পুলিশ আসিয়া মৃতদেহ পোষ্টমর্টম করিতে পাঠাইল। আহতকে হাসাপাতালে এবং বাকী ভাই তিনটিকে হাজতের অতিথিরূপে প্রেরণ করিল।

ক্যাঁচার আঘাত বিষাইয়া পচন ধরিল। কুড়িদিন পরে হাসপাতালেই ব্যথার স্বামী মারা গেল। পাঁচ মাসের শিশু পুত্র কোলে করিয়া ব্যথা বিধবা হইল। সৌভাগ্যবশে মৃত ছোট দেবরটির বিবাহ হয় নাই।

জেল খাটিয়া তিন ভাই দেড় বৎসর পরে বাড়ী ঢুকিল। সংসার তখন হতশ্রী, আর্থিক অবস্থা শোচনীয়। ছোট দুজন চাকুরীর সন্ধানে দেশান্তর গেল। বড়

ভাই সংসার গুছাইতে মন দিলেন। তাঁহার প্রথম কাজ হইল, বিধবা ভ্রাতৃ-বধূর মাতৃদত্ত সম্পত্তিগুলি আইন সঙ্গত উপায়ে আত্মসাৎ করা। দ্বিতীয় কায হইল কু-চিকিৎসায় শিশু ভ্রাতৃষ্পুত্রের প্রাণ সংহার করা।

কায দুটি শেষ হইলে পুত্রশোকার্ত্তা ভ্রাতৃবধূকে 'নিজের পথ' দেখিতে আদেশ করিলেন। অনাথা অর্থ-হীনা নারী এবং সম্পত্তিশূন্য মাতৃহীন শিশুর মত নিষ্ঠুর গলগ্রহ এ সংসারে কে আছে? এক দ্বাদশীর তৃতীয় প্রহরে ভ্রাতৃবধূ সংসারের সব কাজ সারিয়া যখন সবে-মাত্র আহারে বসিয়াছে, তখন "গরু আসিয়া ধান খাই-তেছে, সংসারের অন্ন ধ্বংস করিবার রাক্ষসী তাহা দেখে নাই;" এই সূত্র অবলম্বনে তিনি এমন কুৎসিত ভাষায় ভ্রাতৃবধূকে গালাগালি করিলেন, যে, অভাগিনী সেইখানে ভাত রাখিয়া চোখের জল মুছিতে মুছিতে উঠিয়া পড়িল।

সেই গ্রামেই ব্যথার দূর সম্পর্কীয় এক পিসতুত ভাইয়ের শ্বশুর বাড়ী। ভাই সেই সময় শ্বশুর বাড়ী আসিয়াছিলেন। ব্যথা ভাইয়ের কাছে গিয়া কাঁদিয়া পড়িল। ভাইটি কিঞ্চিৎ আধুনিক ভাবাপন্ন। তিনি

অন্যায়ের 'তোয়াক্কা' রাখিয়া চলিতে জানিতেন না। কর্ত্তব্য-অনুরোধে ভগিনীর ভাসুরকে একবার 'নামে মাত্র' জানাইয়া ভগিনীকে গঞ্জনা অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য নিজালয়ে লইয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভাসুর মহাশয় নিজের ধার্ম্মিকতার সাফাই গাহিয়া ব্যথার নামে জঘন্য কুৎসা রটাইয়া দিয়া দশের সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞা করিলেন, "এরূপ দুশ্চারিণীকে তার মাতৃদত্ত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করাই পরম ধর্ম্ম। অতএব তিনি ঐ হত-ভাগিনীকে এক পয়সার সম্পদও দিবেন না।"

পিসতুত ভাই ব্যথাকে নিজালয়ে লইয়া গিয়া প্রথমেই মূর্খ বোনটির পড়াশুনার বন্দোবস্তে মন দিলেন। বেশী বয়সে, অনভ্যস্ত মস্তিষ্কে পড়াশুনাটা প্রথমে বিভীষিকার মত লাগিল। কিন্তু ক্রমে সহিয়া গেল। খানিকটা অগ্রসর হইবার পর ব্যথা নিজের উৎসাহেই আগাইয়া চলিল। বাংলা, ইংরেজী, অঙ্ক চলনসই রকম শিখিয়া ব্যথা যখন একটু মানুষের মত হইয়া উঠিয়াছে, তখন পিসতুত ভাই দূর দেশে চাকুরী লইয়া চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় কলিকাতায় তাঁহার এক পিসীর আশ্রয়ে

ব্যথাকে রাখিয়া গেলেন। সেই পিসীই ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মধ্যমা পুত্র-বধূ।—ব্যথা তাঁহাকে পিসিমা বলিত।

আজ তিন বৎসর ব্যথা ইহাদের সংসারে বাস করিতেছে। সংসারের সব কাজেই সে লাগে। সুতরাং যখন যাঁর গরজ পড়ে, তিনিই তখন ব্যথাকে অনুগ্রহের চোখে দেখেন। কিন্তু তাই বলিয়া নিরুপায় গলগ্রহকে কেউ সম্মানের চোখে দেখিতে পারে না! সুতরাং বাড়ীর একজনের কৃপায় বাড়ীর আর দশজনের অবজ্ঞা, অবহেলা, অপমান, লাঞ্ছনাটা ব্যথার জন্য চলিয়াই থাকে। ব্যথার চোখে সময়ে সময়ে জল আসে; সঙ্গে সঙ্গেই সে কিন্তু হাসিয়া ফেলে! এই ক্ষুদ্র জীবনটার অঙ্কে দাড়াইয়া সংসারের কত ভোজবাজীই সে দেখিল!—সেগুলা কত অপ্রত্যাশিত, কত অদ্ভুত! সেগুলা যদি নির্ব্বাক সাক্ষী সাজিয়া নিস্তব্ধ হইয়া দেখিতে ও সহিতে পারিয়াছে, তবে এই তুচ্ছ ব্যাপারগুলো অক্লেশে এড়াইয়া চলিতে পারিবে না কেন? বাড়ীর ঝি চাকরগুলির মূর্খতা ও নীচতা,

ব্যথার মত অভাগা আশ্রিতাকে ক্ষমার চক্ষে দেখিবে না, ইহা স্বাভাবিক। বাড়ীর পিসিমাগুলির আলস্য ও আরাম-প্রিয়তা চর্চ্চার পর, অন্য তত্ত্ব চর্চ্চার অবকাশ নাই। সুতরাং ব্যথার মত দুর্ভাগাব দুর্ভাগ্যময় অবস্থাকে সহানুভূতির দিক দিয়া, তাঁহারা বিচার-বিবেচনার বিষয়ীভূত কবিয়া দেখেন না, ইহাতেও আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে—এ বাড়ীর সদা কর্ম্মব্যস্ত,—গম্ভীর স্বভাব পিসেমশাইগুলি ব্যথার ছলছুতা খুঁজিবার চেষ্টায় একান্ত উদাসীন! বাড়ীর কোন নারীকেই তাঁহারা অপমান-লাঞ্ছিত করিয়া চলেন না।—এমন কি, অন্নবস্ত্র যোগাইতেছেন বলিয়া যেটুকু অপমান-লাঞ্ছনা করা পুরুষ মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য,—সেটুকুতেও তাঁহাদের জ্ঞানগোচর নাই! কি যে আপন-খেয়ালে কাজকর্ম্ম করিয়া যান, কিছুই বুঝিবার যো নাই। মেয়েরা উঠিতে, বসিতে, চলিতে, ফিরিতে, অসাবধানে কোথায় কি অমার্জ্জনীয় ত্রুটি ঘটাইল, এবং তার জন্য কোন বিশেষ শ্রেণীর সমার্জ্জনী ব্যবস্থা হওয়া উচিত,—সে সম্বন্ধে এই পিসেমশাইগুলি, না খোঁজেন স্মৃতি, না,

বোঝেন সংহিতা! এ হেন শাস্ত্র-জ্ঞান-বর্জ্জিত মানুষ-গুলিকে দেখিলে ব্যথার ভাসুর মহাশয়ের মত মহা কঠিন, পৌরুষ জ্ঞান-সম্পন্ন প্রবল প্রতাপ পুরুষ কি যে মনে করিতেন, ব্যথা ভাবিয়াই পায় না! তবে ফাঁসি কিম্বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর গোছের একটা কিছু শাস্তির ব্যবস্থা যে করিতেন, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই!

জ্ঞানোন্মেষ হইতে আরম্ভ করিয়া, এ পৃথিবীতে ব্যথা যাহাদিগকে সব চেয়ে নিকটতম আত্মীয় বলিয়া জানিয়াছিল, সব চেয়ে বেশী নৃশংস নির্য্যাতন লাভ করিয়াছিল—তাহাদের কাছেই। দূরের আত্মীয়রা ব্যথার অনেক উপকার করিয়াছেন,—আশ্রয় দিয়াছেন, অন্ন বস্ত্র যোগাইতেছেন, এজন্ত ব্যথা কৃতজ্ঞ। কিন্তু ইঁহারাও যে আত্মীয়,—যথেচ্ছ ভাবে নির্য্যাতন ও লাঞ্ছনা করিবার ষোল আনা অধিকার যে ইঁহাদেরও হাতে আছে,—এ আশঙ্কা ব্যথা এক মুহূর্ত্তের জন্য ভুলিতে পারে না! তাছাড়া, এই অনুগ্রহশীল আত্মীয়দের স্কন্ধে সে যে একটা অনাবশ্যক উপসর্গ—অতিরিক্ত ব্যয়ভারের মতই চাপিয়া বসিয়া আছে,—নিজের এই হীনতা, জীবনটার এই

শোচনীয়-জীবনযাত্রা,—ব্যথাকে গভীরতর লজ্জা ও বেদনা দান করিত—সর্ব্বদাই ! হায় রে, সৎপথে থাকিয়া নিজের ভার নিজের স্কন্ধে বহিবার মত,—একটা পথও যদি এ পৃথিবীতে ব্যথার জন্য খোলা থাকিত......... !

মাঝে ক'দিন কাটিয়া গিয়াছে।

সে দিন আশ্বিনের বিজয়া দশমীর সন্ধ্যা।

প্রকাণ্ড বাড়ীখানা আজ কোলাহলহীন। সদর দেউড়ীতে বসিয়া দ্বারবান এস্রাজে পূরবীর সুর ধরিয়াছিল। দূরে পূজাবাড়ীতে শানাইয়ে বিদায় রাগিণীর করুণ বিষাদ গান আকাশ ছাইয়া ফেলিতেছিল।

সশব্দে একখানা ভাড়াটে গাড়ী আসিয়া দ্বারে থামিল। দ্বারবান এস্রাজ ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সেদিনের সেই প্রৌঢ়া ভদ্র মহিলা গাড়ী হইতে নামিলেন। আজ তাঁহার সঙ্গে দাসী ছিল না। দ্বারবান অন্তঃপুরের পথ দেখাইয়া দিয়া বলিল, "আইয়ে মায়ি—"

প্রৌঢ়া মহিলা অন্তঃপুরে ঢুকিলেন। চারিদিক নিস্তব্ধ। ইতস্ততঃ করিয়া অনুচ্চস্বরে তিনি বলিলেন, "কই, এঁরা সব কোথা?"

মুহূর্ত্তে ব্যথার শয়ন কক্ষের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল।—সন্ধ্যার অন্ধকারে ক্ষীণছায়ার মত একটা শীর্ণ অস্পষ্ট মূর্ত্তি দুয়ারের কাছে দেখা গেল। প্রৌঢ়া অনুমানেই চিনিলেন। সহাস্য মুখে নমস্কার করিয়া, অগ্রসর হইতে হইতে বলিলেন, "চিঠির জবাব পাইনি, সেইজন্যে জ্বালাতন করতে এলুম। খবর কি ?"

দূরাগত প্রতিধ্বনির মতই একটা ক্ষীণ স্বর ধ্বনিত হইল, "নমস্কার! আসুন।"

দুয়ারের পাশের অনুজ্জ্বল হ্যারিকেনের আলোটা একটু উজ্জ্বল করিয়া দিয়া, ব্যথা সেইখানেই ধূলোর উপর বসিয়া পড়িল। সুগভীর শান্তি-কাতরতা-মাখা কণ্ঠে বলিল, "আমার চোখে সব ধোঁয়ার মত লাগ্ছে। আপনাকে দেখ্তে পাচ্ছি নে। আপনি খাটে বসুন।"

"না। আপনার সামনেই বস্ছি। আপনার অসুখ করেছিল?" নিকটে বসিয়া, উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে ব্যথার মুখের দিকে চাহিয়া প্রৌঢ়া প্রশ্ন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ব্যথার শীর্ণ শিথিল জ্বরতপ্ত হাতখানি সস্নেহে নিজের মুঠোর মধ্যে তুলিয়া লইলেন।

ব্যথা বসিতে পারিতেছিল না। শুইয়া পড়িল। ক্লান্ত-রুদ্ধ স্বরে বলিল, "অসুখ করেছিল। কদিন জানিনে। মাতালের মত করে ফেলে রেখেছিল। সেই সময় এঁরা কবে যে পুরী চলে গেছেন, কিছুই জানি নে। ওঁদের আমি বড্ড বিপদে ফেলেছি। কি যে মনে করছেন ওঁরা জানি নে। আমার সমস্ত ভার বইচেন, অথচ তাঁদের দরকার মত কাজে লাগলুম না! এম্নি অসময়ে অসুখ ধর্‌লো। ভগবান! আমায় এই ক'টাদিন ভাল রাখ্‌লে না কেন?" ব্যথার চোখে জল ঝরিতে লাগিল। ক্ষীণস্বরে বলিল, "পুরীতে তাঁরা রাঁধুনী পাবেন না হয় ত। কত কষ্টই হবে তাঁদের! নিজেকে নিয়ে কি যে করি আমি! জ্বালাতন!"

প্রৌঢ়া অনুমানেই তাহার কথার অর্থ বুঝিলেন। একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন, "বাড়ীর সবাই পুরী বেড়াতে গেছেন? আপনাকে এখানে দেখ্‌ছে কে?"

ধীরে উত্তর হইল, "দরওয়ান আছে, বুড়ী-ঝি বাড়ী আগ্‌লাতে আছে, ওই বেচারাই দেখ্‌ছে। ওরা আমার জন্যে বড্ড কষ্ট পাচ্ছে। মানুষকে যে কি

দুঃখই দিচ্চি, সে মনে করলেও কষ্ট হয়! এর চাইতে মরা ভাল!—"

কথাটা নিতান্তই সাধারণ প্রচলিত একটা অতি সাধারণ জনপ্রিয় উক্তি মাত্র! যাহার আলস্য না হয়, তিনিই ও কথা বলিয়া থাকেন। সুতরাং আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই, এবং বাঁচার চেয়ে মরাটা যে কোন হেতুবশে ভাল, সে প্রশ্নটা উত্থাপনও অনাবশ্যক। মহিলাটি একটু নীরব থাকিয়া, ক্ষুণ্ণ অনুযোগের স্বরে বলিলেন, "আপনি আমায় একটু খবর দেন নি কেন? এত অসুখ করেছে আপনার!"

ব্যথা হাসিল। করুণ কণ্ঠে বলিল, "আমি নিজের খবর নিজেই রাখ্‌তে পারি নি যে! আপনার চিঠিগুলো এসেছে, সব বিছানায় জমা হয়ে পড়ে আছে। একখানিও পড়্‌তে পারি নি! ভাগ্যিস্ কবিতা কটা আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিলুম, নইলে আর পাঠান হোত না। আর একটা লিখে রেখেছি, বোধ হয় ট্রাঙ্কের ওপর পড়ে আছে,—আপনি একটু খুঁজে নিন্।"

"থাক্ থাক্। আপনি ভাল হয়ে উঠুন আগে। উঃ,

আপনি কি কাহিল হয়ে পড়েছেন! কথা বল্‌তেও আপনার কষ্ট হচ্ছে খুব, দেখ্‌ছি।"

"হবে না?"—ব্যথা গভীর বিষাদভরে হাসিল। তীব্র বেদনা-নিষ্পীড়িত কণ্ঠে বলিল, "ধার আর ভিক্ষা,—এই নিয়ে যাদের জীবনের কারবার চল্‌ছে,—তাদের কথা বল্‌বার শক্তি জুটবে কোথেকে! দিদি, এবার মরে যদি —বেঁচে উঠ্‌তে পারি,—মরে বেঁচে উঠি যদি, তাহলে কথার মত সত্যি কথা, আপনাদের অনেক শোনাব! অনেক কথা বল্‌বার আছে আমার,—কিন্তু এ জন্মটায় সেগুলো বল্‌বার বোধ হয়—" সহসা ব্যথার কণ্ঠস্বর জড়াইয়া গেল, নিঃশব্দে মূর্চ্ছা আসিয়া তাহার দুর্ব্বল দেহযন্ত্র বিকল করিয়া দিল!

• মহিলাটি উঠিয়া দাঁড়াইয়া ডাকিলেন, "বাড়ীতে কে আছ, একটু জল নিয়ে এস। ইনি মূর্চ্ছা গেছেন।—"

জলের ঘটি হাতে করিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বুড়া-ঝি ঘরে আসিয়া মহা বিরক্তির সহিত বলিল "বাবাঃ! আবার মূর্চ্ছা!—ওমা, এ কি গো, ধূলোয় লুটুচ্ছে যে! ... ...হয়ে গেল না কি! ভ্যাখোদেখি বাপু কি

আক্কেল! এ রাতে মরা ফেল্‌বার লোক পাই কোথা? তাই বাপু মলি হাঁসপাতালে গিয়ে মলি না কেন? হাসপাতাল যাব যাব কর্‌লি, গেলি না-ই বা কেন?’

ঝির হাত হইতে জলের ঘটি লইয়া মূর্চ্ছিতার মুখে জল দিতে দিতে প্রৌঢ়া বলিলেন “চুপ কর।”

ঝি ব্যাকুল হইয়া বলিল, “তা কর্‌ছি। কিন্তু তুমি বুঝি হাসপাতালের ম্যাম্। আমাদের জাত ধর্ম্মের কথা বোঝ ত সব। আর ত ওকে আমাদের ঘরে ঠাঁই দিতে পারি না। ওকে তোমাদের সেখানে নে যাও, মরে গেলে ম্যাথর দিয়ে ফেলিও।”

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া প্রৌঢ়া বলিলেন, “কাকে ঘরে ঠাঁই দেবে না? ইনি তোমার মনীবদের আত্মীয়া নয়?”

“রাম রাম! সে সম্পর্ক আর রইল কৈ? ও তো সাহেব হয়ে গেছে গো! জানো না বুঝি? বলে সেই নিয়ে সে দিন বাড়ীতে হৈ হৈ হয়ে গেল, সে কি কাণ্ড! বাজার সরকার ভূতো মুখুজ্জি শুদ্ধু বল্‌লে,—বেথা-দি’র আর জাত নেই! ওনাকে আর ‘জেতে’ নেওয়া হবে না। ম্যাম্ যাকে এসে টাকা দেয়, সে মেয়ের কি জাত

থাকে ? তুমিই বল না বাছা। মেজ কর্ত্তা রেগে উঠ্‌লেন,—তা রাগ্‌লে কি হবে ? পাঁচজনের মুখে তো আর হাত-চাপা দেওয়া যায় না। সবাই বল্‌লে সাহেব হয়ে গেছে ! ও-মেয়ে লাট সায়েবের দরবারের কাজ করে যদি ট্যাকা কামায়, তা হলে জাত থাকে কি ?"

ভদ্র মহিলা স্থির দৃষ্টিতে ঝিটির মুখের দিকে চাহিয়া কথাগুলি শুনিলেন। ধীরে বলিলেন, "কত টাকা কামিয়েছিলেন ? লাট সাহেবের দরবারটা বসেছিল-ই বা কোথা ?"

"তা জানি নে বাছা। রাজি-ঝি সে সব দেখেছে, বড়মা সইকে বল্‌লে, চশমা জুতো পরা ম্যাম্ এসে ট্যাকা দিয়ে গেছে। ভাখো-না বাক্স খুলে চার টাকা জমা আছে। এক ট্যাকা খরচ করে পাহাড়িকে দু গণ্ডা বক্‌সীস দিয়ে কাগজ কিনেছে, টিকিট কিনেছে,—সে মহামারী কাণ্ড !—তাই জন্যেই তো আমরা আর ওনার ঘর ঢুকি না। ছোঁব কি করে বল ? আমাদের তো জাত আছে ! মেজ মাও তাই বলে গেছে, ভাল হ'লে মেয়ে খুশী যেন চলে যায়। পাঁচটার বাড়ী, এখানে

মেজ মা আর ত ওনাকে রাখ্‌তে পারে না। ভাই-ঝি বলে এনে রেখেছিল, কিন্তুন্ 'রীতে' না থাক্‌লে মেজ মাই বা কি করে?"

ভদ্র মহিলা স্তব্ধ। ব্যথার সংজ্ঞালাভের সূচনা হইতে-ছিল, নির্ণিমেষ নয়নে সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া তিনি বলিলেন, "রোগীকে কি খেতে দিচ্ছ?—"

ঝি সহসা অত্যন্ত রুক্ষ হইয়া বলিল "কি খেতে দেব? দু পয়সার খই বাতাসা এনে দিইছিনু, খায় নি। আমি আর কি কর্‌ব? ও তো আর আমায় টাকা দিয়ে বাঁদী রাখে নি। আমি পরের চাকর, ঐ এনে দিইচি, ঐ ঢের!"

ভদ্র মহিলা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ট্রাঙ্কের কাছে গিয়া একটা কাগজের কোণ ছিঁড়িয়া লইয়া বলিলেন, "আমার নাম ঠিকানা লিখে রেখে যাচ্ছি। যদি তোমার মনীবরা এসে এর সন্ধান করেন, সেই ঠিকানায় খবর নিতে বোলো। আমি একে আমার বাড়ীতে নিয়ে যাচ্ছি।" দোয়াতে কলম ডুবাইয়া তিনি ক্ষিপ্রহস্তে ঠিকানা লিখিতে লাগিলেন।

আশ্চর্য্য হইয়া ঝি বলিল, "বেথা-দি তোমার আপনজন কেউ হয় না কি গো ?"

লেখা শেষ করিয়া তিনি সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন "হাঁ। আমার ছোট বোন্। তোমার মনীব-দের বোলো, আমার কাযের জন্যই আমি একে টাকা দিয়ে গেছলুম সে দিন। আমার সাত পুরুষের সঙ্গে লাট সাহেবের দরবারের কোন সম্পর্ক নেই। আর আমি নিজে মেম কি সাহেব, ম্যাথর কি মুদ্দোফরাস, কালো কি সুন্দর, বেটে কি লম্বা, —সে সম্বন্ধে তোমার যা প্রাণ চায় বর্ণনা কোর। আর তোমার মনীবদেরও বোলো,—মিথ্যে কথা বলে মেছো হাট গড়ে,—যত খুশী মহামারী কাণ্ড তাঁরা করতে পারেন করুন। আমি মিথ্যাবাদী কাপুরুষদের বিলক্ষণ চিনি।"

ঝি সে কথার অর্থ কি বুঝিল কে জানে। একটু ভাবিয়া বলিল, "তা তোমাদের লোক, তোমরা নিয়ে যাবে যাও। কিন্তন্ বিছানাটা তো আমরা দেব না, আমাদের আবার নূতন রাঁধুনি আসবে, তাকে তো শোবার জন্যে বিছানা দিতে হবে........।"

ঘৃণার স্বরে উত্তর হইল, "রেখে দাও বিছানা। কিন্তু এর কাগজগুলো আমি ছাড়্‌ব না। কেন না, তার মানে তোমরা বুঝ্‌বে না। কাগজগুলো আমি নেব।"

সাগ্রহে উত্তর হইল, "নে যাও মা, নে যাও। ও ছেঁড়া কাগজের জঞ্জালগুলোয় উনুন-ধরানো ছাড়া আর কিছু হবে না। ও জঞ্জালগুলো নে যাও। আর তোরঙ্গটাও নে যাও। ওতে কিছু নেই মা, কিছু নেই'—শুদ্ধু সেই গাদা গাদা ছেঁড়া কাগজের জঞ্জাল! না আছে একখান্ কাপড়, না আছে একটা গয়না! ও তোরঙ্গ নিয়ে আমরা কর্‌ব কি? তবে......তবে...... সেই ট্যাকা চাট্টে ওতে আছে মা আছে।—"

সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া অর্দ্ধ মূর্চ্ছিতা রুগ্নাকে দুহাতে তুলিয়া ভদ্রমহিলা বাহিরে গিয়া গাড়ীতে তুলিলেন। দ্বারবান ব্যাপার কি বুঝিল না,—বখ্‌শীশের আশায় ছুটিয়া আসিল। ভদ্র মহিলা বলিলেন,—"একটু কায চাই বাপু, এস।"

ভিতরে গিয়া ট্রাঙ্কটি দ্বারবানের মাথায় চাপাইয়া

দিয়া ঘরের চারিদিকের খুচরা কাগজগুলি একে একে গুছাইতে গুছাইতে, সহসা তাঁহার নিজের নাম ও ঠিকানা লেখা একটা খামে মোড়া চিঠি পাইলেন। সম্ভবতঃ ব্যথার অসুখের পূর্ব্বে কোন সময় চিঠিখানা লেখা হইয়াছিল, ডাকে ফেলা হয় নাই। চিঠিখানি ও সমস্ত কাগজগুলি হাতে লইয়া তিনি বাহিরে আসিলেন। দ্বারবানকে পুরস্কার দিয়া গাড়োয়ানকে গাড়ী হাঁকাইতে আদেশ দিলেন। গাড়ী দ্রুত ছুটিল।

গাড়ীর ঝাঁকানি খাইয়া, অর্দ্ধ তন্দ্রাতুর ব্যথা চমকিয়া সভয়ে বলিল, "কোথা নিয়ে যাচ্ছেন দিদি ?"

সস্নেহে উত্তর হইল, "ভগবানের রাজ্যের ভেতরেই যেখানে হোক দিদি! আমি বড় বোন কাছে রয়েছি, ভয় কি ?"

আশ্বস্ত ক্ষীণ উত্তর আসিল—"কিছু না।"

আলোকোজ্জ্বল বাজারের পথ দিয়া গাড়ী ছুটিতে-ছিল। ভদ্র মহিলা গাড়ীর বাহিরে ঝুঁকিয়া খাম ছিঁড়িয়া চিঠিখান পড়িতে লাগিলেন। তাঁহার উদ্দেশে সম্মান

জ্ঞাপন করিয়া, ব্যথা তাঁহার একটা জিজ্ঞাস্যের উত্তর লিখিয়াছে ;—

"অভাগার এই হাসি, ছদ্মবেশী অশ্রুরাশি
কি জানিবে, হায় বন্ধু, তার ইতিহাস ?
লাঞ্ছিত অদৃষ্ট সনে, যুঝিতে জীবন পণে
ক্লান্তি জুড়াবারে সৃজি,—ব্যঙ্গ পরিহাস !
বেদনাশ্রু রোধিবারে, উদগ্র বিগ্রহ তরে—
মৃত্যু অবসাদে করি তীব্র প্রতিবাদ !
সৃজি এ তরল হাসি, লয়ে অশ্রু বাষ্পরাশি
লয়ে বঞ্চিতের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ !
হতভাগ্য এই হাসি !— এরে বল ভালবাসি ?
ধন্য ভালবাসা !—মোর শ্রেষ্ঠ পুরস্কার !
থাক কথা ! কাজ নাই,—ভাল লাগে ? ভাল তাই !
লহ অশ্রু বেদনা'র, শ্রদ্ধা নমস্কার ।"

অশ্রু-ছল-ছল নয়নে ক্ষণেক নির্ব্বাক থাকিয়া ভদ্র

মহিলা ধীরে বলিলেন, "আজ বিজয়া। ব্যথা, তোমায় আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি।"

কষ্টে চোখ খুলিয়া অন্ধকার গাড়ীর মধ্যে, দুহাত কপালে ঠেকাইয়া অতি কষ্টে রুদ্ধ ক্ষীণ স্বরে ব্যথা বলিল, "বিজয়ার নমস্কার দিদি।"

সূক্ষ্ম-ধর্ম্মজ্ঞান

রায় গিন্নি—রায় গিন্নি, ওগো শান্তিপুরের গিন্নি—"

বছর ত্রিশ বয়সের একটি যুবক, হরিনামের ঝুলি-হাতে মালা জপিতে জপিতে বাড়ী ঢুকিয়া,—বিকট সিংহ-নাদের কাছাকাছি উৎকট উচ্চনাদে হাঁকিলেন,—"......ও, শান্তিপুরের গিন্নি!"

বাড়ীর কোণে, খোড়ো চালের গোয়াল ঘর হইতে ঝির সঙ্গে, দুধের বোক্‌নো হাতে করিয়া একটি বৃদ্ধা বাহির হইয়া বলিলেন, "কি গো, গৌরগোপাল যে, এস, এস, কত ভাগ্যি।"

গৌর-গোপাল মহোদয়ের আপাদমস্তকের কোন-খানেই এতটুকু গৌরত্বের চিহ্ন ছিল না, এবং গোপালত্বের মধ্যে—ভগবান বাসুদেবের কংসধ্বংস-কালীন উগ্র সংহার মূর্ত্তিটার আঁচ যৎকিঞ্চিৎ অতিরিক্ত থাকিলেও,

অন্য বিশেষ কিছু সাদৃশ্য ছিল না। চেহারা লম্বায় বেশ দীর্ঘ, চওড়াতেও বোধ হয় এক সময় মানানসই রকম ভাল ছিল, কিন্তু এখন আর নাই। মুখের গঠন সুশ্রী, কিন্তু ভাব বড় বিশ্রী-কর্কশ দম্ভময়,—সোজা কথায় 'ধরাখানা সরা' জ্ঞানের তুল্য মূল্য উৎকট মুরুব্বিয়ানা জ্ঞাপক,—যা-হোক একটা কিছু বটে! পরনে কালা-পেড়ে কাপড় ও থ্রি-কোয়াটার হাতাওয়ালা লংক্লথের পাঞ্জাবী। পায়ে খড়ম, গলায় তিনকণ্ঠি মালা, বিষ্ণু-ভক্তির অব্যর্থ প্রমাণ-স্বরূপ, নীরব সাক্ষ্যে শোভা পাইতেছে।

ঠানদিদি সম্পর্কীয়া, প্রতিবেশিনী বৃদ্ধার আহ্লাদ-গদ গদ আহ্বানে গৌর-গোপালের দম্ভ-অলঙ্কৃত মুখ যেন অতিরিক্ত দম্ভের উগ্র-আতিশয্যে ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। সগর্ব্বে রোয়াকে পৈঠার দিকে পা বাড়াইয়া অনাবশ্যক উচ্চতায় কণ্ঠ চড়াইয়া প্রবল নিনাদে বলিলেন, "ভাগ্যি কি আর সাধে হয় রে বাপু, তোমার গুণে হয়; তুমি এখনও বেঁচে আছ তাই তোমাদের ছেলেদের বাড়ীতে দয়া করে পায়ের ধূলো দিতে আসি,

নইলে তুমিও যেমন!—আজকালকার দিনে কে কার খবর রাখে বলো তো, হুঁঃ!"

বিপুল আত্মশ্লাঘাময়ী আত্মমহিমার গর্ব্বে দিশেহারা-গোছ একটা অসাধারণ অবস্থার কাঁধে ভর দিয়া, শ্রীযুত গৌর-গোপাল যেমন রোয়াকের পৈঁঠায় পা দিবেন, অমনি হঠাৎ নজর পড়িল,—খড়-কুটি-জঞ্জালে অপরিচ্ছন্ন পেঁঠার উপর, গৃহপালিত বাছুরের বিষ্ঠার সঙ্গে কতক-গুলি ছাগ-বিষ্ঠাও শোভা পাইতেছে! তৎক্ষণাৎ আঁৎকাইয়া উদ্যত-চরণ সামলাইয়া, ক্ষোভে-রোষে বজ্র-নাদে হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন, "এ্যাঃ! ছি-ছি-ছি! বলি তোমরা হিন্দু না কি গো? বাড়ীর ভেতর ছাগল-নাদি ছড়ানো! একটা ছাগলনাদি মাড়ালে, গঙ্গা-স্নানের সকল পুণ্যক্ষয় হয়, আর তোমাদের বাড়ীময় এতো? তোমরা কোনখানে হিঁদু বল তো? এ যে হাড়ির বাড়ী হ'য়ে রয়েছে!"

পাপ পুণ্যের হিসাব-জ্ঞানে সূক্ষ্ম বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন গৌর-গোপাল মহাশয়, ছাগ-বিষ্ঠার প্রভাবে, পুণ্য লোকসানের আশঙ্কায় যত ক্রুদ্ধই হউন,—কিন্তু স্বাস্থ্য

তত্ত্বে অন্ততঃ,—সাধারণ ক, খ, জ্ঞানটা যাঁহার আছে, এমন কেহ সেখানে দাঁড়াইয়া যদি সে বাড়ীর চারিদিকে ভাল করিয়া চোখ বুলাইতেন, তবে নিশ্চয়ই দেখিতে পাইতেন, শুধু ছাগল-নাদি মাত্র নয়, গৃহ-পালিত গরু বাছুর গুলিও এমন সুচারু বন্দোবস্তে গৃহে পালন করা হয়—যাহাতে সেই উপকারী জন্তুগুলি গৃহস্থের উপকার যত করিতে পারুক বা না পারুক, গৃহস্থের স্বাস্থ্যকে 'টাট্‌কাজবাই' করিতে বাধ্য হয়,—অনেক উপায়ে-ই! জন্তুগুলির মলমূত্রের ক্লেদ-বাষ্প এমন ভাবেই মানুষের আহার নিদ্রা বসবাসের স্থানের, ঘনিষ্ঠ-সংলগ্ন! শুধু তাই নয়, তার উপর উপরন্তু আছে,—খড়-কুটি, ঘাস, পচা-খোলভরা ডাবার দুর্গন্ধ, এবং বাড়ীর সমুদায় আবর্জ্জনা ও ক্লেদপূর্ণ প্রকাণ্ড আস্তাকুঁড়ের অসহ্য উৎকট-দুর্গন্ধ-বাষ্প। তা সেগুলার জন্য স্বাস্থ্য বিষাক্ত হইয়া মানুষগুলা যতই ভুগিয়া মরুক, গঙ্গাস্নানের পুণ্য তো হ্রাস হয় না, তাই যথেষ্ট! কিন্তু সমস্যা-আতঙ্ক শুধু ঐ ছাগ-বিষ্ঠা লইয়াই।

গৌর-গোপালের ভৎর্সনা-নিনাদের উগ্র ধাক্কায়

বৃদ্ধা গৃহিণী তৎক্ষণাৎ চটিয়া উঠিলেন, তাঁহার ঝি-চাকর এবং পুত্রবধূদের উপর! গৃহিণীর আদরের-পোষ্য ছাগলগুলি, নিরঙ্কুশ প্রতাপে বাড়ীর সর্ব্বত্র রাজত্ব করিয়া বেড়াইবে, তাহাতে কাহারও বাধা দিবার অধিকার নাই, কেহ বাধা দিতে চাহিলে বা অসন্তোষ জানাইলে,—পারিবারিক সম্পর্কের পদমর্য্যাদা অনুসারে তাহাকে লঘুগুরু দণ্ড লাঞ্ছনাও ভোগ করিতে হয়। কিন্তু আজ গৃহিণী তাহাদের উদ্দেশেই ছাগলের সমস্ত দোষ উৎসর্গ করিয়া, পৈঁঠা অপরিষ্কার থাকার জন্য যে তাহারাই দায়ী—সেটা মুক্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিলেন! কলিকালে ঝি চাকর বধূরা যে তাঁহার ধর্ম্ম কর্ম্ম পর্য্যন্ত ধ্বংস করিয়া দিল, সেজন্যও চেঁচাইতে ত্রুটি করিলেন না।

গরুর রাখালটা গোয়াল ঘর হইতে ঝাঁটা হাতে ছুটিয়া আসিয়া পৈঁঠা পরিষ্কার করিয়া দিল। গৃহিণীর আদেশে একজন ঝি জড়সড়ভাবে আসিয়া মহামান্য গৌর-গোপালের জন্য পীঁড়া পাতিয়া দিল। গৌর বসিয়া মালা ঝাঁকাইয়া কালোয়াতী সুরে কীর্ত্তন সুরু করিলেন, "তোমার বৌরা কেমন ভদ্দর লোকের মেয়ে বল দেখি?

চাকর-বাকরের 'ওপীক্ষেয়' গরু বাছুরের সেবা ফেলে রাখে ? হোত আমাদের বাড়ীর বৌ, তাহলে তিন দিনে ঢিট্ করে দিতাম ! আমাদের বড়বৌ আর ছোটবৌ কায কর্ম্ম সেরে রাত বারোটায় গোয়াল ঘরে গিয়ে, গরম জল দিয়ে গরুর গা-চুঁচে দেয়,—তবে গিয়ে বিছানায় গড়াতে পারে। আমার শাসন এমন নয় বাবা !—"

শ্রোতা ও বক্তার মধ্যে ধাতের মিল থাকিলে, আসর জমে ভাল। গৌর-গোপালের বধ্-শাসন-শক্তির পৌরুষ-প্রভাবের মহিমায় অভিভূত হইয়া গৃহিণী ভক্তি-গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বলিলেন "তোমাদের শাসন আছে—তা বৌরা ভাল থাক্‌বে না ? তোমাদের সে ছোটবৌ মর্‌তে যাচ্ছে অমন স্হতিকে রোগ হয়েছে, তবু ধুঁকে ধুঁকে সংসারের রান্না থেকে গরুর সেবা থেকে বাসন মাজা ঘর নিকানো সব কর্‌ছে। ঐ করেই তো অত শীগ্রী টপ্ করে মোল,—ডাক্তারও বল্লে। কিন্তু কৈ করুক দেখি আমার বৌরা তেম্নি !—তা আর কর্‌তে হয় না, গতর সব কত ! তাতে আবার সব 'রাংএর রাধা'

বারমাসই রোগ! তোমাদের বাড়ীর বৌ আর আমাদের বাড়ীর বৌ,—বলে কিসে আর কিসে!"

বাস্তবিকই অস্বাস্থ্যকর পরিবেষ্টনের মধ্যে নানা অনাচারে জীবন যাপনের ফলে, পল্লীগ্রামের সাধারণ মানুষদের স্বাস্থ্য যেমন হইয়া থাকে, এ বাড়ীর সকলের স্বাস্থ্যও তাই। কিন্তু সে স্বাস্থ্যহানির জন্য, লাঞ্ছনা ভোগ করে শুধু চির অবহেলার পাত্রী—বধূরা। বিশেষতঃ অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর স্থানে, অপেক্ষাকৃত ভাল আব্-হাওয়ার মধ্যে যাহাদের শৈশব কাটিয়েছে, সেই পরের মেয়েগুলি এ বাড়ীতে আসিয়া আগেই স্বাস্থ্য হারাইয়াছে; তার জন্য দায়ী তাহারাই! বাড়ীর মুরুব্বিরা যে স্বাস্থ্যরক্ষা বিধির দিকে চোখ দেন না, সেজন্য কোন কথাই চলিতে পারে না, যে হেতু তাঁহারা বধূ নয়, বাড়ীর কর্ত্তা! সুতরাং স্বেচ্ছাধীন স্বায়ত্ত-শাসন ব্যবস্থায় তাঁহারা একছত্রী সম্রাট্!

যাই হউক আধ ঘণ্টার উপর, এবাড়ী ও বাড়ীর বধূদের দোষ-গুণের তীব্র সমালোচনার পর,—গৃহিণী বলিলেন, "তোমাদের বাড়ীতে আজ রাঁধলে কি?'

গৌর-গোপালের অন্যান্য সদ্‌গুণের মধ্যে আর একটি মহৎগুণ ছিল, তিনি কখনও 'ছোট কথা' বলিতে পারিতেন না। সুতরাং রান্নার সম্বন্ধে, এমন এক প্রকাণ্ড ফর্দ্দ দাখিল করিলেন, যেটা তাঁহাদের অবস্থার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। কিন্তু ভক্তির পাত্র কখনও অব-হেলার জিনিস নয়, অতএব গৃহিণী অকপট ভক্তিভরে তাও সত্য বলিয়া মানিলেন।

সহসা গৌর তাঁহাদের গরীব ব্রাহ্মণ বিধবা রাঁধুনীটির উদ্দেশে একটা ইতর কটূক্তি করিয়া বলিলেন, "বেটী আজ বাড়ী চলে গেল। বুঝলে রায়গিন্নি, বেটীর আজকাল ভারী দেমাক্ হয়েছিল, আজকালকার দিনে ছোটলোকদের যত তেজ কি না! কি বল্‌বো, দাদা যে বড়বৌকে এবার চাক্‌রীস্থানে নিয়ে গেল; নইলে ছোটবৌ আঁতুড়ে যাবার সময় আমি কি রাঁধুনী রাখি?"

লম্বা চওড়া জাঁক-জমক ভরা, বিশেষণ লাগাইয়া গৌর-গোপাল, প্রচণ্ড-পুরুষত্ব-বিকাশক, অশ্রাব্য অকথ্য গালিগালাজ ঝাড়িয়া, তাঁহাদের রাঁধুনীটির উদ্দেশে যে অভিযোগ ঘোষণা করিলেন, তাহা সহজ ভাষায় অনুবাদ

করিলে এই অর্থ দাঁড়ায়,—গৌরের প্রথম পক্ষের একপাল ছেলের ঝক্কি পোয়াইয়া, দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর আঁতুড় তুলিয়া এবং অতিরিক্ত সাংসারিক কাযের খাটুনীর চাপে গরীব ব্রাহ্মণ বিধবার সম্প্রতি মাসখানেক স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়, সে ছুটি চায়। কিন্তু গৌর-গোপাল মহাপ্রাণতার পরিচয় দিয়া, তাহার মাহিনা আট্‌কাইয়া রাখেন, কিছুতেই ছুটি দিতে রাজী হন নাই, তাই গৌর-গোপাল রাঁধুনীর উপর চটিয়া, তাহাকে সাগু বার্লি পর্য্যন্ত খাইতে দেন নাই। কাল রাত্রে রোগ-যন্ত্রণাতুরা অনাহার-অবসন্না, অসহায়-আশ্রিতা কাতর আর্ত্তনাদে যখন বার বার চেচাইয়াছে, "ও বাবা গৌর, একবার ওঠো বাবা, আমায় একটুখানি জল দিয়ে যাও বাবা—" তখন 'বাবা গৌর' পাশের ঘরে সস্ত্রীক পুত্র কন্যা লইয়া গভীর আরামে বিছানায় শুইয়া, সেই আর্ত্তনাদ শুনিতে শুনিতে নিঃশব্দে 'অপার্থিব মজা উপভোগ' করিয়াছেন! যেহেতু ছোটলোকদের তেজ ভাঙ্গিবার—ইহাই সদুপায়!

গৌর-গোপালের বীরত্ব গৌরবে গৃহিণী সকৌতুকে সায় দিতে ত্রুটি করিলেন না,—কিন্তু তবুও কি জানি

কেন, ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাঁহার মুখ দিয়া একটা প্রশ্ন বাহির হইল, "তার পর শেষকালে উঠে অবিশ্যি জল দিলে ?"

"ক্ষেপেছ তুমি !" বজ্র-নিনাদে সদর্পে গৌর বলিল, "গৌর সিংগীকে সে ছেলেই পাও নি রায় গিন্নি ! আমি আবার উঠে তাকে জল দেব ? কি গরজ ? আমি সব চুপ করে পড়ে পড়ে শুনেছি, আর মনে মনে হেসে কুটি কুটি হয়েছি ! সাড়া দিতে আমার বয়ে গেছে !"

গৌর-গোপালের অসাধারণ মহত্ত্বে গৃহিণী আশ্চর্য্য ও মুগ্ধ হইয়া গেলেন,—পুরুষের পৌরুষ বলে ত ইহাই ! —হায়, তিনি কবে তাঁহার বাড়ীর অবাধ্য দাস দাসীদের এমন কি সুবিধা হইলে পুত্রবধূদের পর্য্যন্ত এম্নি সুকৌশলে জব্দে ফেলিয়া, গৌর-গোপালের মত প্রভুত্ব শক্তিকে ধন্য করিতে পারিবেন ?

গৌর বলিলেন, "আজ সকালে তার বাড়ীর লোক এসে গরুর গাড়ী করে নিয়ে গেল।"

গৃহিণী বলিলেন, "মাইনে দিলে ?"

একটু থামিয়া তাচ্ছিল্যের স্বরে গৌর বলিলেন, "ছোটলোক ব্যাটারা,—মাইনে কি ছাড়ে? দিয়ে দিলুম কিছু,—তবে সব নয়।"

(২)

এই সব ধরণের বহু বহু শ্রুতি-মধুর উপাদেয় আলোচনার পর সন্ধ্যার ঝোঁকে গৌর রায় গিন্নির বাড়ী ছাড়িয়া অন্যত্র টহল দিতে বাহির হইলেন।

পথে একদল নিম্ন-শ্রেণীর স্ত্রীলোক সমস্ত দিনের দিন-মজুরী খাটিয়া, বাড়ী ফিরিতেছিল। গৌর মালা হাতে পথের পাশে দাঁড়াইলেন, কদর্য্য লালসামাখা, লোলুপ কটাক্ষে প্রত্যেক স্ত্রীলোকটিকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে হঠাৎ বজ্রনাদী কণ্ঠস্বরে ঝিঝিট-খাম্বাজ ভরিয়া, —নিজের ভদ্রত্বের মর্য্যাদা ভুলিয়া, অসঙ্কোচে তাহাদের উদ্দেশে গাহিয়া উঠিলেন :—

লাল জবা চাঁপা ফুল এধার ওধারে !
কোথা ফেলে গেলি, ভরা ভাদরে ॥

ইহারা ছাদপেটা প্রভৃতি কাযের সময় এক ঘেয়ে

ঐক্যতানে ঐ রকম সব গান গাহিয়া থাকে। এ গান তাহাদের চির পরিচিত; 'বাবু'-মহিমা-অলঙ্কৃত মহা-পুরুষের মুখে নিজেদের নিজস্ব গান শুনিয়া তাহারা আহ্লাদে কৃতার্থ-জীবন হইয়া গেল! ইহাদের পাড়ায় গৌরবাবুর প্রসার অপরিসীম; প্রত্যহই সন্ধ্যার পর সেখানকার স্ত্রীলোক বিশেষের বাড়ীতে গৌরবাবুর গোপন-পদধূলি পড়ে। সুতরাং সেই পথের মাঝে,—তাহাদের সঙ্গে গৌরবাবুর এমন দরের রসিকতা রসালাপের তুফান ছুটিল, যাহা ভদ্র-সমাজের ধাতে অসহ্য!

ফোর্থ ক্লাসের বিদ্যায় বছরে দু-মাসের বেশী ত্রিশ টাকা মাহিনার কেরাণীগিরি না জুটিলেও,—গৌর-গোপাল বাবু,—বাবু ত বটে! ভগবানের রাজ্যের অন্নবস্ত্রের কাঙ্গালী দুর্দ্দশা-পীড়িত হতভাগ্য গরীবদের তিনি মর্ম্মান্তিক ঘৃণা অবজ্ঞায় পদদলিত করিয়া চলিলেও এবং রায়গিন্নির মত সমজদার শ্রোত্রী ও শ্রোতামহলে নিজের পৌরুষ কীর্ত্তনে, হাজার বাহবা লাভে দম্ভস্ফীত হইলেও—ইতর ইন্দ্রিয়পূজার স্বার্থে ইহাদের শ্রেণী-

বিশেষের জন কয়েকের জন্য তাঁহার নাড়ীর টান বেশ টন্‌টনে সজাগ আছে !

যাহাই হউক রসিকতার তুফানে চুবন খাইয়া জন্ম-সার্থক করিয়া, মেয়েগুলি নিজের গন্তব্য পথে চলিয়া গেল। গৌর বাবুও মালা ঝাঁকাইয়া কৃষ্ণের রাসলীলা বিষয়ক কি একটা গান গাহিতে গাহিতে নির্জ্জন সন্ধ্যাপথ মুখরিত করিয়া অন্যদিকে চলিলেন।

(৩)

কিছুদূর আসিয়া একটা পথের মোড় ফিরিতেই দেখা গেল, সন্ধ্যার আবছায়া-ঢাকা, পুকুর ঘাটের পথ হইতে গ্রাম্য পুরোহিতগোষ্ঠির মেয়ে, বিধবা সরলা ব্রাহ্মণী এক ঘড়া জল কাঁখে করিয়া ভিজা কাপড়ে সপ্ সপ্ করিয়া আসিতেছে, সঙ্গে তাহার পাঁচ বছর বয়সের শিশু পুত্র। গৌর থমকিয়া দাঁড়াইয়া গলা খাঁখারি দিয়া ডাকিলেন, "কে রে সরলা ?"

বয়সের হিসাবে মেয়েটি গৌরগোপালের মত ব্যক্তির পক্ষে 'তুই-তো-কারীর' যোগ্য মোটেই নয়; কিন্তু গৌর বাবু, 'বাবু মানুষ',—তায় মেয়েটির পিতৃ-গোষ্ঠির সম্মান্ত যজমান, এবং গ্রামসুবাদে মেয়েটির কাকা সম্পর্কীয় মুরুব্বি, তাই নিজের মুরুব্বিয়ানাটুকু ষোলআনা ফলাইয়া, অতি হিতৈষীজনোচিত মমতা দেখাইবার জন্য, 'তুই-তো-কারীটা' মুখস্ত করিয়া

রাখিয়াছেন। মেয়েটিও বড় দুঃখী; দরিদ্র পুরোহিত পিতার সংসারে বড় দুঃখেই দিন কাটে। গৌরকাকার মত অবস্থাপন্ন হিতকাঙ্ক্ষী প্রতিবেশীদের একটা মৌখিক হিতৈষিতাও, সে হতভাগীর কাছে বড় বেশী মূল্যবান। অবজ্ঞার 'তুই' সম্বোধন, সে স্নেহ-সৌভাগ্য মনে করে।

সরলা নিকটে আসিয়া বলিল, "হ্যাঁ কাকা, কাপড় কেচে আস্‌তে বড় দেরী হয়ে গেল। তুমি কাল হুগলী গিয়েছিলে ?"

গৌর অলক্ষিতে একবার পথের এদিক ওদিক চাহিয়া, একটু নীচু স্বরে বলিলেন "হ্যাঁ বাপু গেছলুম, রামকেষ্ট সা বল্লে, এই শনিবার দিনের মধ্যেই রেজিষ্ট্রী করে দিতে হবে। ভাখো বাপু, আর কথার নড় চড় করে আমায় 'থাত্তাই' এ ফেলো না, বুঝ্‌লে। আমি কথা দিয়ে এসেছি, তোমায় শনিবার দিন হুগলী নিয়ে গিয়ে, রেজিষ্ট্রী করিয়ে দিতে পার্‌লে, তবে আমার দায় উদ্ধার! কি বলো, ভদ্দর লোকের কথাই জাত!"

সরলা ব্যগ্র কণ্ঠে বলিল, "আড়াইশো টাকার ওপর আর কত বাড়িয়ে দেবে ?"

গৌর সগর্ব্বে বলিলেন "পুরোপূরি তিনশোই ঠিক করে এলুম। তোমার গৌরকাকা সে ছেলেই নয় বাবা, যে ঠকে ফির্‌বে। কতদিনের পতিত, এঁদো-পড়া দোকান ঘর, ও কি টাকা দিয়ে কেউ নিতে চায় রে বাবা, ভাগ্যে আমি ছিলুম তাই রামকেষ্ট সাকে রাজী করিয়েছি। আমি না থাক্‌লে, কারুর বাবার সাধ্যি নাই যে তোর ওঘর বিক্রি করায়। এই তো এতদিন পড়ে ছিল, কেউ পেরেছিল বিক্রি করতে? দেখলুম না কি নেহাৎ তুই কষ্ট পাচ্ছিস্‌ তাই,—একটা পয়সার অভাবে ছেলেটার রোগে ওষুদ পর্য্যন্ত জুটছে না তাই ... ... ।"

সরলা কৃতজ্ঞ চিত্তে হিতৈষী কাকার কর্ম্মতৎপরতা ও নিঃস্বার্থ পরোপকার ধর্ম্মের জয় গান করিয়া-- শেষে একটু ক্ষুণ্ণভাবে বলিল "বিধবা বাম্‌ণীকে তুমি যে কি দয়া করলে কাকা, সে বল্‌বার নয়। তোমার ছেলেদের বাড় বাড়ন্ত হোক, কিন্তু সা-মশাইকে বলে কয়ে, আরও যদি ২।১ শো বাড়াতে পার্‌তে তবেই ন্যায্য দাম হোত। তখনকার দিনে, তোমার জামাই

ও ঘরখানা আটশো টাকায় কিনেছিল। আমার কপাল পুড়েছে। তাই এত কমে আজ বেচ্‌তে হচ্ছে, তবু যদি পাঁচ শো টাকাও পেতুম—"

বাধা দিয়া উগ্র-অসহিষ্ণুভাবে গৌর বলিলেন "সে কি আর সা' মশাইকে বল্‌তে বাকী রেখেছি রে বাপু? তোরা মেয়ে মানুষ, ঘরের কোণে বসে থাকিস্, পৃথিবীর খবর কি জানিস বল? আমি কি চেষ্টার ত্রুটী করেছি...।"

গোটা কতক কড়া ধমকে সরলার প্রার্থিত ন্যায্য দামের আশা ইহজন্মের মত ঠাণ্ডা করিয়া গৌর উত্তেজিত ভাবে বলিলেন "ও বিষয়ের দাম এখনকার দিনে ওর বেশী আর হবে না, এখন বিক্রি কর্‌বার ইচ্ছে কি না তাই বল্?"

প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই সরলাকে উত্তর দিবার অবকাশমাত্র না দিয়া গৌর অধিকতর উগ্রভাবে পুনশ্চ বলিলেন "আর বিক্রির ইচ্ছেই যদি না ছিল, তবে আমাকে মাঝে রেখে মিছামিছি ধাষ্টেমো করলি কেন? যদি দিবিই না, তবে এ ঢলাঢলি করা কেন?

মেয়ে মানুষের জাতের মাথায় সাত ঝাঁটা! মেয়ে মানুষের কথায় থাকাই আমার ঝকমারী!”

ভয়ে সরলার প্রাণ উড়িয়া গেল! হিতৈষী কাকা দর্পিত-অনুগ্রহে যেটুকু দয়া করিতেছেন, সেটুকুও বুঝি যায়! ভীতি-জড়িত স্বরে বলিল “না কাকা, তুমি রেগো না। আমি ঐ টাকাতেই দেব, শনিবারেই তোমার সঙ্গে হুগলী যেয়ে রেজেষ্ট্রী করে দিয়ে আস্‌বো। তোমার কথা কি ঠেল্‌তে পারি,” ইত্যাদি।

প্রসন্ন হইয়া কাকা বলিলেন, “তাই বল বাবা, কথার খাত্তাই কি সহজ কথা? তুই কি মনে করিস্‌, আমি জোচ্চুরি করে তোকে ঠকিয়ে দিচ্ছি? তোর যাতে দুপয়সা হয়, সে কি আমি দেখব না.... তা হলে আমার ধর্ম্ম আর কৈ?”

রকমারী বচনের বুক্‌নী ঝাড়িয়া গৌরগোপাল নিঃসংশয়ে সরলাকে বুঝাইয়া দিলেন,—হরিনামের মালা হাতে শপথ করিয়া তিনি বলিতেছেন,—তিনি একজন নিঃস্বার্থ পরোপকারী দরিদ্র বন্ধু, মহাত্মা-লোক। দরিদ্র ব্রাহ্মণ বিধবার দুঃখে, তাঁহার বিশ্ব-প্রেমিক

প্রাণটা নাকি নেহাৎ গলিয়া গিয়াছে, তাই তিনি সরলার উপকারের জন্য, এত কষ্টে শহরে হাঁটাহাটি করিয়া রামকৃষ্ণ সাহাকে হাতে পায়ে ধরিয়া খরিদদার জুটাইয়াছেন, নচেৎ সরলা খাইতে পাইল আর না পাইল সে খোঁজ রাখিবার তাঁহার—কি-ই বা গরজ ? আর কি-ই বা বহিয়া গেল ?

নিঃস্বার্থ পরোপকারী হিতৈষী কাকার জন্য অজস্র কল্যাণ প্রার্থনা করিয়া সরলা বাড়ী গেল। গৌর অন্যত্র আড্ডা জমাইতে চলিলেন।

তার পর দুদিন কাটিয়াছে। সেদিন সন্ধ্যায় গৌর-গোপাল নিজের বৈঠকখানাঘরে বসিয়া, প্রতিবেশীদের কাণ জ্বালাইয়া বিরাট উচ্চনাদে কীর্ত্তন গাহিতে-ছিলেন :—

"গৌর প্রেমের ঢেউ লেগেছে গায়।
ও তার, হিল্লোলে পাষণ্ড দলন, ব্রহ্মাণ্ড তলিয়ে যায়।"

হঠাৎ মস্ মস্ শব্দে জুতা পায়ে দুইজন ভদ্রলোক বৈঠকখানায় ঢুকিলেন।—একজন রায় গিন্নির ছোট ছেলে নিতাই বাবু, আর একজন গ্রামের একটি শিক্ষিত ভদ্র সন্তান। দুজনেই হুগলী কোর্টে কি কাজ করেন।

রায় গিন্নির কাছে গৌরের প্রসার প্রতিপত্তি যতই থাক, রায় গিন্নির এই ছেলেটিকে গৌর বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না। হঠাৎ ইহাদের অপ্রত্যাশিত আগমনে চমক খাইয়া গৌর শশব্যস্তে যেমন উঠিবেন,

অমনি দেখিলেন, বিধবা সরলা ব্রাহ্মণীও তাহাদের পিছু পিছু বৈঠকখানায় ঢুকিল।

গৌরগোপালের 'গৌর প্রেমের ঢেউটা' হঠাৎ যেন কঠিন পাহাড়ের বুকে আছাড় খাইয়া, দম আটকাইয়া সটান পঞ্চভূতে মিলাইয়া গেল। তিনি অবাক্ হইয়া বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া রহিলেন।

নিতাই বাবু, একবর্ণও অনাবশ্যক ভূমিকা নাকরিয়া, সোজাসুজি বলিলেন, "রামকেষ্ট সার কাছে, সরলার হুগলীর দোকানঘরখানা কত টাকায় বিক্রি করে দিচ্ছ গৌর?"

গৌর শুষ্ককণ্ঠে বিষম খাইয়া কাসিয়া উঠিলেন। অত্যন্ত আশ্চর্য্যের সুরে বলিলেন "কোন রামকেষ্ট সা?" নিতাই বাবু বলিলেন "হুগলীর আড়তদার।"

উদাস ভাবে গৌর বলিলেন "অ! তা সে তো সরলাকে জিজ্ঞেস্ কর্‌লেই জান্‌তে পার্‌বে, আমায় জিজ্ঞেস্ করার মানে?"

নিতাই বাবু সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন, "রামকেষ্টসা এটার দাম কত টাকা দিতে চেয়েছে, তুমি বল।"

"সরলাকেই জিজ্ঞেস্ কর না, ও তো জানে। আমি তো আর লুকোচুরি খেলিনি, যে রাখ্ রাখ্ ঢাক্ ঢাক্ করব।—ওই বলুক না।"

সঙ্গী ভদ্রলোকটী বলিলেন "কেন? তুমি নিঃস্বার্থ পরোপকারী, গরীবের বন্ধু—তুমিই বল না। দালালী তো ভাই, তুমিই করছ! রামকেষ্ট সা নাকি তিনশো টাকার বেশী এতে দেবেন না? তোমায় বলেছেন তো তিনি?"

কট্ মট্ চক্ষে চাহিয়া গৌর রুষ্টস্বরে বলিল "কি tricks খেলবার মতলবে তোমরা এসেছ বলো তো?—চালাকি করবার জায়গা আর পাও নি নয়, তাই—"

ভদ্রলোক ব্যঙ্গস্বরে বলিলেন "রামঃ! তুমি কি পিতৃহীন নাবালক ছেলে, না—মুরুব্বিশূন্য অশিক্ষিতা নির্ব্বোধ বিধবা মেয়ে, যে তোমার সঙ্গে tricks খেলে চালাকী করে—এক নিঃশ্বেসে চারশো টাকা হজম করে, বেমালুম পার পেয়ে যাব? ত্যাখো তো ভাই, রামকেষ্ট সার এই চিঠি আর দলিল, এ ভদ্রলোক তিনশো দিচ্ছে না—সাতশো টাকা দিচ্ছে?"

ভদ্রলোক চিঠি ও রেজেষ্ট্রীর জন্য প্রস্তুত দলিলখানি খুলিয়া গৌরবাবুর সামনে ধরিলেন, দলিলখানির লিখন-কর্ত্তা স্বয়ং গৌরবাবুই ছিলেন,—হস্তাক্ষর অস্বীকারের পথ নাই! গৌরবাবু আড়ষ্ট হইয়া আড়চোখে চিঠি-খানার দিকে চাহিলেন, রামকৃষ্ণ সাহা নিজের নাম স্বাক্ষর করিয়া নিতাই বাবুর উদ্দেশে জানাইতেছে যে, 'সরলাদেবীর দোকান ঘর খরিদ বাবদ তিনি সাত শ টাকা দিবেন, মধ্যস্থ গৌরবাবুর সঙ্গে এই কথাই পাকা-পাকি ঠিক হইয়া গিয়াছে। গৌরবাবুর দালালী ফি তিনি আলাদা দিবেন। আগামী কাল শনিবারে,—রেজেষ্ট্রী হওয়া চাই। গৌরবাবুকে বলিবেন।'

নিতাইবাবু বলিলেন "কি গৌর, সাত শ টাকার সম্পত্তি বিক্রি করে, মালিক শুধু তিনশো টাকা পাচ্ছে বাকী চারশো কি তোমার কমিশন?"

সরলা অসহ্য দুঃখে হাউমাউ করিয়া কাঁদিয়া মাথা চাপড়াইয়া পাগলের মত আর্ত্তনাদ করিয়া বলিল "হ্যাঁ কাকা, আমি যে বিশ্বাস করে সব তোমার হাতে ছেড়ে দিয়েছিলুম! আমি এক পয়সার কাঙাল,—বড়

হতভাগী!—আমার মত কাঙাল গরীব বিধবা পেয়ে কেমন ক'রে গলায় ছুরি দিতে বসেছিলে কাকা ?"

অন্যায় অত্যাচারের দাসত্বে যে কাপুরুষ নিজের সমস্ত মনুষ্যত্ব বেচিয়া খাইয়াছে, সে যখন শক্ত পাল্লায় ঠেকিয়া ন্যায়ের গুঁতা খায়, তখন তাহার অত্যাচারী স্বভাব হাতের কাছে যে দুর্ব্বল জীবটাকে পায়, সেইটার গলা টিপিয়াই নিষ্ফল আক্রোশ চরিতার্থ করিতে চায়!—গৌরগোপাল ধর্ম্মাভিমান কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান সব হারাইয়া ক্ষিপ্ত পশুর মত হঠাৎ সরলার উপর লাফাইয়া গর্জ্জিয়া হাঁকিলেন "নিকাল্ '——' বেটী, দূর হ আমার বাড়ী থেকে।"

নিতাইবাবুর সঙ্গী ভদ্রলোকটি গৌরগোপালের পথরোধ করিয়া বলিলেন, "তার জন্যে প্রস্তুত হয়েই তোমার বাড়ী এসেছি বাবা, দুশ্চিন্তা নিষ্প্রয়োজন! কিন্তু নিরপরাধ অসহায় স্ত্রীলোকের ওপর জানোয়ারের মত—পিশাচের অত্যাচার করাটায়—তোমার গঙ্গাস্নান আর মালা ঠক্‌ঠকানি পুণ্যের কি বাড়্‌বাড়ন্ত হয়, সেটা তোমার ধর্ম্মশাস্ত্রের পাতা খুলে একবার আমায়

দেখিয়ে দাও তো বাপ্! জন্মটা সার্থক করেই আজ বাড়ী ফিরি তা'হলে!"

শৃঙ্খলাবদ্ধ বানরের মত নিষ্ফল ক্ষোভে দাঁত খিঁচাইয়া খ্যাঁক ম্যাক করিয়া গৌর পাগলের মত উপর্য্যুপরি বলিল "বেরো সব, বেরো আমার বাড়ীর থেকে, দূর হ—দূর হ আমার বাড়ী থেকে, এখনি বেরো।"

ভদ্রলোক হাসিমুখে বলিলেন "বহুৎ আচ্ছা, বহু ধন্যবাদ! তোমার 'গৌর প্রেমের ঢেউ' এবার নির্ব্বিবাদে ব্রহ্মাণ্ডটাকে রসাতলে তলিয়ে দিক্, আমরা খুসী হয়ে তারিফ্ করব। আপাততঃ—নমস্কার।"

তিনজনে বৈঠকখানা ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেলেন।—

সে রাত্রে গৌরবাবুর বৈঠকখানায় আর গৌরপ্রেমের ঢেউয়ের উল্লাস তরঙ্গ বহিতে শোনা গেল না। এবং তারপর বহুদিন পর্য্যন্ত তিনি গঙ্গাস্নান পুণ্য কিসে ক্ষয় হয়, আর কিসে অক্ষয় অমর হইয়া থাকে সে সম্বন্ধে সূক্ষ্ম শাস্ত্রার্থ উপদেশ করিতে, রায়গিন্নির বাড়ীতে পায়ের ধূলা দিতে পদার্পণ করেন নাই, এইরূপ শোনা যায়।

লোক্‌সানের সন্ধ্যায়

(১)

কি কুক্ষণেই সেদিন সন্ধ্যায় কারখানার তহবিলের হিসাব মিলাইতে বসিয়াছিলাম। আলমারীর ভিতর হইতে একেবারে এতগুলা টাকার আকস্মিক অন্তর্দ্ধান! মাথা ঘুরাইয়া দিল যে!—

নিজের মণিব্যাগ শুদ্ধ চার শো চৌষট্টি বেমালুম উধাও হইয়াছেই তো! তার উপর কারখানার টাকা হইতে দুশো পঞ্চান্ন পর্য্যন্ত অন্তর্দ্ধান করিয়াছে! কিসে আমি এ খরচ করিলাম? অসম্ভব! বাবাকে বলিব কি?

তাড়াতাড়ি হিসাব বহিখানা টানিয়া হিসাব করিতে বসিলাম, নাঃ, খরচ যা করিয়াছি, তার হিসাব ঠিকই রাখিয়াছি, কারখানার তহবিলে দুশো পঞ্চান্নই নাই

বটে! আর আমার নিজের চারশো চৌষট্টি—সে তো নিশ্চয়ই নাই! বিপন্ন বন্ধুদম্পতীর সাহায্যের জন্য ওটা আলাদা রাখিয়াছিলাম, ও টাকা আমি কিছুতেই খরচ করি নাই—বেশ মনে আছে!

লোক্‌সানের টাকা দু দফা এক সঙ্গে যোগ দিলাম, হিসাব হইল মোট সাতশো উনিশ টাকা!—

উঃ! এতগুলা টাকা! চোর ধরি কাকে?—সাতাশ জন কর্ম্মচারী আমার অধীনে খাটিতেছে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই ভদ্রসন্তান!—সকলকেই বিশ্বস্ত বলিয়া জানি। আজ এই বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধ কাকে দিই?—

ভাবিতে লাগিলাম, দোষ কার? ভাবিতে ভাবিতে সকলের আগে যে দোষীর নামটি পয়লা নম্বরেই আমার মনে পড়িল,—তিনি আমার পিতৃদেব! সত্যই তো দোষ আর কাকে দিব? মেডিকেল লাইনের পথ ধরিয়া, না হয় বছর কয়েকের জন্য বিলাতটাই ঘুরিয়া আসিয়াছি, তাই বলিয়া কি এমন লায়েক হইয়া পড়িয়াছি যে, টাকা আগ্‌লানো ব্যাপারটায় পর্য্যন্ত বাবা আমায় এতটা বিশ্বাস

করেন ? ছেলেবেলা হইতে তিনি বরাবর দেখিতেছেন, জিনিষ, পত্র, টাকা, কড়ি হারাইতে আমায় চেয়ে নিপুণ-দক্ষতা কারুর নাই,—তবুও তিনি যদি আমার যোগ্যতার উপর শ্রদ্ধা না হারান, তবে সেটা তাঁর বিবেচনার দোষ নয় কি ?

রোগবীজাণু পরীক্ষার আমোদটাই জীবনের সারসর্ব্বস্ব করিয়া লইয়াছি—এদেশের রোগ আর রোগীদের পক্ষে উপযোগী গোটাকতক ঔষধ যদি আবিষ্কার করিতে পারি, তবেই না জীবনটার আনন্দ সার্থক হয় ! তা নয়, এই সব জঘন্য টাকা চুরির ব্যাপার লইয়া মাথা ঘামানো ! নাঃ, আজ আর সন্ধ্যায় ল্যাবরেটারিতে যাওয়া মিথ্যা ! ওই সাতশো উনিশের হিসাবটা, মাথার যন্ত্র-তন্ত্রগুলা একদম বিগড়াইয়া দিয়াছে !

চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, পশ্চিমের রাজবাড়ীর 'কল' হইতে ফিরিয়া, কাল বাবা যখন হিসাব দেখিতে বসিবেন, তখন দুশো পঞ্চান্নর খবর তাঁকে কি করিয়া জানাইব ? আর বন্ধুকেও যে কালই টাকা দিবার কথা আছে তার ব্যবস্থাই বা কি করিব ?

হিসাব করিয়া দেখিলাম, কাল ল্যাবরেটারির কাজ কামাই করিয়া একবার ব্যাঙ্কে না ছুটিলে, এ সমস্যার কোনই মীমাংসা হইবে না! মনটা খারাপ হইয়া গেল—দূর হোক্ ছাই, টাকা যাক্, তাকে পারি, কিন্তু ওই যে সময় নষ্ট হওয়া,—ওটা আমার কিছুতেই সহ্য হয় না! এই জন্যই তো চোরকে ক্ষমা করিতে ইচ্ছা হয় না!—আহাম্মকের মত অসময়ে টাকা সরাইয়া, এই যে মানুষকে ত্যক্ত বিরক্ত করা, এ যে কোন-দেশী রসিকতা, কিছু বুঝিতে পারি না।

যাক্!—যার অভাব আমার চেয়েও বেশী, টাকাটা সেই 'না চাহিয়া লইয়া' গিয়াছে। এখন এর জন্য অনর্থক হৈ হৈ, রৈ রৈ করিয়া মনের অধৈর্য্য-অপ্রসন্নতা আর বাড়াই কেন? বরং বিরক্তিটা যাতে জয় করিতে পারি, সেই চেষ্টাই ভাল।

বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, শ্রাবণের মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ভরিয়া রিম্ রিম্ ঝিম্ ঝিম্ শব্দে বর্ষা দেবতার সান্ধ্য-অভিযান চলিয়াছে। কলিকাতা শহরের মত জায়গায় বৃষ্টি জিনিসটার মত বেয়াড়া বেথাপ্পা,

কদর্য্যতার অত্যাচার আর কিছুই নাই! এমন দিনে, না-ইচ্ছা-হয়, রাসায়নিক পরীক্ষাগারে বসিতে, না-ইচ্ছা-হয় কোন ভাল কায করিতে! বরং ইচ্ছা করে, বন্ধু বান্ধবের দল ডাকিয়া তাস পাসার মত কোন লক্ষীছাড়া খেলা লইয়া, ঘণ্টা দুয়ের জন্য মাতিয়া উঠিতে—

অফিসের পিছনের বারেণ্ডায় ছোট বোনটির কচি গলার মিষ্টি গানের সুর ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল,—

"সংসার যবে মন কেড়ে লয়,
জাগে না যখন প্রাণ
তখনি হে নাথ, প্রণমি তোমারে
গাহিব সে তব গান।"

কাণ পাতিয়া একটু শুনিলাম, মনের অবসাদ ঘোর কাটিয়া, একটা নূতন উৎসাহ জাগিয়া উঠিল,—আঃ! আজকের দিনে আমার গান বাজনার ওস্তাদটি যদি একবার আসে, তবে তার বাজনার সঙ্গে সুরে বেসুরে খানিকটা চেঁচাইয়া বাঁচি যে!—সময়ের অভাবে সুকুমার কলাবিদ্যার কোন কিছু চর্চ্চাই করিতে পারি না, শুধু

ভালবাসা ভুলিতে পারি নাই, ওই গান বাজনাটার উপর!—সত্যই, এমন মধুর, এমন পবিত্র, এমন সুন্দর জিনিস আর নাই!

ওস্তাদের কথা মনে হইতেই স্মরণ হইল,—সে বেচারীর শরীর আজ কাল মোটেই ভাল নাই। মেডেক্যাল কলেজে পড়িবার সময় হাঁসপাতালের কাজের সম্পর্কে একদা তার সঙ্গে আমার আলাপ হয়, নিউমোনিয়ার কল্যাণে। তার পর আর একবার সে মোটর দুর্ঘটনায় পা ভাঙ্গিয়া, হাঁসপাতালে আসে, সেবারে আমার হাতেই তার ষোল আনা ভার পড়ে, এবং সেই ঘনিষ্ঠতার সুযোগে ওস্তাদ আবিষ্কার করিয়া বসে, সঙ্গীত বিদ্যায় আমার না কি প্রকৃতিদত্ত একটা আশ্চর্য্য শক্তি আছে। লোকটার জেদে পড়িয়া, বাবার কাণ বাঁচাইয়া কিছুদিন চর্চ্চা করিয়াছিলাম, তারপর পড়া শেষ করিবার জন্য বিলাত যাওয়ার সময় সঙ্গীত বিদ্যাকে বাক্সবন্দী করিয়া রাখিয়া যাই। বিলাত হইতে ফিরিয়া শুনিলাম, আমার সেই চির কুমার চরিত্রবান ওস্তাদ নিউমোনিয়া-দাগী দুর্ব্বল ফুস্‌ফুস লইয়া বিলাতী বাঁশির চর্চ্চা করিতে গিয়া ওস্তাদীর ঝোঁকে

মাত্রাতিরিক্ত উৎসাহে বাঁশি ফুঁকিয়া, রক্ত-ওঠা ব্যামো ধরাইয়াছে। খোঁজ তল্লাস করিয়া তাকে ডাকাইয়া চিকিৎসার ভার নিজ হাতে লইলাম। ওস্তাদ তার ক্লারিওনেট্‌টা আছড়াইয়া ভাঙ্গিয়া আমার পায়ের কাছে ফেলিয়া দিয়া বলিল "ভাইজি, রক্ত-খেকো যন্তর এই তুস্‌মন্‌টা! আমার শপথ রইল এটার চর্চ্চা কথনো কোর না।"

যে বিজ্ঞানের চর্চ্চা সুরু করিয়াছি, তাতে মরিবার সময়ই কুলাইয়া উঠিতে পারি না, তা ক্লারিওনেট্‌ চর্চ্চা! হাসিয়া অভয় দিলাম, - এ জন্মের মত!

ওস্তাদ মাঝে মাঝে আসে। তার গুণের জন্য তাকে সম্মান করি, তার স্বভাবের সৌন্দর্য্যের জন্য তাকে ভাইয়ের মতই ভালবাসি। বয়সে সে আমার চেয়ে বছর দুইয়ের বড়।

(২)

বসিয়া বসিয়া ওস্তাদের কথাই ভাবিতে লাগিলাম। ছোট বোনটির গান যে কখন থামিয়া গেল, টের পাইলাম না।

মনে পড়িতেছিল, মেডিক্যাল কলেজ হইতে নিউমোনিয়ার পর সে বাহির হইবার সময়, তার বুকের অবস্থাটা আমার কাছে কিছু সন্দেহজনক ঠেকিয়াছিল বলিয়া, আমিই তাকে বিবাহ করিতে বারণ করি। আজ ওস্তাদের শরীরের অবস্থা দেখিয়া আমার কেবলই মনে হয়,—ক্লারিওনেট্ শুধু ওস্তাদকেই আজ ধ্বংসের কবলে ঠেলিয়াছে, কিন্তু ওস্তাদ যদি বিবাহ করিত, তবে তার বংশ শুদ্ধ সকলকে অভিশপ্ত করিয়া ছাড়িত! যেমন এ দেশের শতকরা ছিয়াত্তরটা অযোগ্য-বিবাহের সুযোগ্য-পরিণাম অহরহ চোখের উপর ঘটিতে দেখিতেছি! শতকরা চুয়াল্লিশটা দূষিত রক্তের শরীর, আর শতকরা

বত্রিশটা কম-জোরী-বুক,—এ কি বিবাহের যোগ্য? আরে বাপু, বিবাহ করা ছাড়া সংসারে মানুষের করিবার কাজ কি আর কিছুই নাই? এ দেশ আজ, কাজের মানুষের কাঙাল—যাও না বাপু সেই পথে; তা'হলে দেশটার—পৃথিবীটার অনেক উপকারই তোমাদের দ্বারা হইবে। সে পথে চলিতে যারা আলস্য-চর্চ্চার ব্যাঘাত ভয়ে কুণ্ঠিত,—তাদের জন্য বানপ্রস্থের পথ খোলা আছে। কিন্তু, বিবাহ করা কেন? ওটা যে শুধু আত্মহত্যা আর পরহত্যা মাত্র!

ওই অযোগ্য-বিবাহ আর বাল্য-মাতৃত্ব, এবং বহু বহু সন্তান সৃষ্টি—এই জঘন্য অনাচারটার ফল দেখিয়া দেখিয়া, চোখও যত ক্ষরিতেছে,—আমার দিলও তত চটিতেছে! ভাবিতে ভাবিতে এক এক সময় আমার তাক্ লাগিয়া যায়, বাস্তবিক এই মানুষগুলার রুচি কি অদ্ভুত্!

পর্দ্দার আড়াল হইতে উঁকি মারিয়া ছোট বোনটি ডাকিল "দাদু-ভাই।"

"উঁ?"

"আস্‌ব ?"

"এসো।"—ইজি চেয়ারটায় আড় হইয়া পড়িয়া নেহাৎ অন্যমনস্কতার সঙ্গেই উত্তর দিলাম।

একটি টুকটুকে লাল গোলাপ ফুল হাতে করিয়া কাছে আসিয়া ছ বছর বয়সের ছোট বোনটি দাঁড়াইল। নির্ব্বাক বিস্ময়ে খানিকটা আমার দিকে চাহিয়া থাকিয়া আস্তে ডাকিল "দাদু—"

মাথা তুলিয়া চাহিয়া বলিলাম "কি ? কাগজ চাই ?"—আমার হিসাব-পত্র লেখার বাতিল কাগজগুলি সে লইয়া যাইত।

ঘাড় নাড়িয়া সুদীর্ঘচ্ছন্দে সে বলিল, "না—কিন্তু তুমি এমন বড্ড-বড্ড লক্ষ্মী ছেলেটির মত শুয়ে আছ কেন বল দেখি ?"

হাসিয়া ফেলিলাম ! থাক্,—অযোগ্য বিবাহ, বাল্য-বিবাহ, কুসন্তান, সৃষ্টি ইত্যাদি লইয়া যাদের মূর্খতার বিরুদ্ধে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছি, তারা কেউই যখন আপাততঃ সামনে উপস্থিত নাই,—তখন উপস্থিতের মত ছোট বোনটিকে লইয়াই একটু রঙ্গ করা যাক্ !

দু'চক্ষু কপালে তুলিয়া সুগভীর বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলাম, "ওমা ! আমি বুঝি দুষ্ট ছেলে তা হলে ?"

অনুতপ্ত ভাবে তাড়াতাড়ি আমার ঠোঁটে হাত চাপা দিয়া সে বলিল, "না, না, তা বল্‌ছি নি, তা নয়। আমি বল্‌ছি তোমার কি কারুর জন্যে মন কেমন কর্‌ছে, তাই অম্নিটী করে শুয়ে আছ ?"

মন কেমন ?—হাসিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু পারিলাম না। সত্যই আমার মন কেমন করিতেছে,—মানুষের কুবুদ্ধি সৃষ্ট—অনন্ত অপার দুঃখ অকল্যাণ দেখিয়া সত্যই আমার মন বড় ক্ষুব্ধ ব্যথিত ! জীবনকে, জীবনের সুখকে এরা এমন বীভৎস বিকৃতভাবে উপভোগ সুরু করিয়াছে, যে সত্যকার সুখ স্বস্তি ভোগের সম্বন্ধে এদের কোন কাণ্ডজ্ঞান আছে কি না, আমায় তাই সন্দেহ হয় !

"দাদু-ভাই, ও দাদু"—

আঃ, জ্বালাতন করিল !......সোজা হইয়া উঠিয়া বসিলাম ; বোনটির মুখের দিকে চাহিয়া মায়া হইল,—না, যত বড় পাষাণ্ডই হই, এই ছোট বোনটির উপদ্রবে

বিরক্ত হওয়া চলিবে না। চিন্তাশক্তির রাশ টানিয়া নিজেকে একটু সংযত করিলাম,—ঠাট্টার সুরে বলিলাম কি রে?"

উৎসাহ পাইয়া সে আমার কাছে ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। আমার রিষ্ট ওয়াচ্‌টার উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে, হাসিমুখে বলিল "একটা কথা বল্‌ব, আমায় বক্‌বে না?"

ও বাবা!—এমন ভাবে চুক্তিবন্দী হইয়া মানুষকে কথা বলিবার স্বাধীনতা দিলেই তো গিয়াছি!—কিন্তু তবু আমি ভালবাসিতাম এই ছোট বোনটিকে! শুধু ছোট বোন হওয়ার জন্য নয়,—শুধু সুকুমার-মূর্ত্তি সুন্দর শিশু বলিয়া নয়,—আমি একে ভালবাসি, এর প্রখর-সুন্দর বুদ্ধিমত্তার জন্য। আমার অফিসের বাহিরের দিকের এই বারেণ্ডায় গিয়া, ক্ষুদ্র প্রায়ই রাস্তার লোক চলাচল দৃশ্য দেখিবার জন্য দাঁড়ায়। দৃশ্যটার মধ্যে ও যে কি অভিনবত্ব উপলব্ধি করে জানি না, কিন্তু প্রত্যেক মানুষের হাঁটিবার কায়দা, চক্ষের দৃষ্টির বিশেষত্ব এবং ঠোঁটের হাসির বৈশিষ্টটুকু, ও যে কি গভীর মনোযোগে নিরীক্ষণ করে, আমি তার সংবাদ জানি! কারণ ওর সমস্ত রিপোর্টই আমার

দরবারে দাখিল হইয়া থাকে। ওর পর্য্যবেক্ষণ শক্তি এবং বর্ণনা-ক্ষমতাকে আমি বাস্তবিকই বিস্ময়ের চোখে দেখি! আমি ওকে উৎসাহ দিবার জন্য সত্যকার ছেলে খেলাতে মিশিয়া, নিজের অনেক সময় নষ্ট করি, তবুও ওর বুদ্ধি-চর্চ্চায় বাধা দিই নাই। যদিও জানি, মেয়েদের পক্ষে ওই জিনিষটা চর্চ্চার মত এমন জঘন্য অপরাধজনক মহাপাপ আর কিছুই নাই, এদেশে!

দুহাতে তার মাথাটি টানিয়া, সস্নেহে কপালে চুমো দিয়া বলিলাম, "না, বক্‌ব না, বল।"

হাসি হাসি মুখে একটু ইতস্ততঃ করিয়া সে বলিল, "এই...তুমি বেশ সুন্দর কি না, একটু সাজোন-গোজন করলেই তোমায় তাই বেশ মানায়,—সুদ্দু একটা ফুল পর্‌লেও!—"

কথাটা বলিয়াই সে আগ্রহোজ্জ্বল চোখে একবার আমার মুখের দিকে, একবার আমার কোটের ফুলটার দিকে চাহিল।—আরে গেল যা। এটা তো কম নয়! এ বুঝি আমায় ফুল পরাইয়া, বাহার দেখিতে মনোনিবেশ করিয়াছে!

খোলা প্রাণে উচ্ছ্বসিত কৌতুকে হাসিয়া বলিলাম, "উত্তম, উত্তম, উত্তম,—তার পর!"

আমার হাসিটায় সহৃদয়তার লেশমাত্র নাই দেখিয়া সে একটু দমিয়া গেল। অপ্রস্তুতভাবে একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ক্ষুণ্ণ অনুযোগের স্বরে বলিল, "যাও ভাই, তা'হলে আর বল্‌ব না!"

অপমান-বোধটা তার খুব তীব্র মাত্রায় ছিল! সত্যই সে আর কিছুতেই কিছু বলিল না। কিন্তু না বলিলেও আমার বুঝিতে বাকী রহিল না, এই প্রসঙ্গে সে যে কথাটা বলিতে চাহিতেছিল—সেটা সেই পুরানো কথা, একদিন খুব ভাল করিয়া ফুলের সাজসজ্জা পরাইয়া, বর সাজাইয়া সে আমার একটা বিবাহ দেওয়াইতে ভারি ব্যগ্র!

ব্যগ্র তো সবাই! কিন্তু হায়, হায়, হায়! অত বড় গুরুতর শুভকর্ম্মটি সুসম্পন্ন করিবার জন্য মানুষের পক্ষে যতখানি সময় যতটা সুযোগ্যতার প্রয়োজন,—আমার যে তার কিছুই নাই! যাক্ সে কথা!

একটু অন্যমনস্ক থাকিয়া বলিলাম "ক্ষুদ্র, আজ আমার

ওস্তাদ আসে নি, একটু গান শুনতে বড় ইচ্ছে হচ্ছে; তুমি—একটু শোনাও না।”

“আহা!”—বলিয়াই সে আমার হাত ছাড়াইয়া ছুটিয়া বাহিরের বারেণ্ডায় রাস্তার লোক চলাচল দেখিবার জন্য গেল। হতাশ হইয়া থামিলাম,—জানি, ও সেই শ্রেণীর শিশু, যারা নিজের খুসীর উচ্ছ্বাসে নিজের মনে বেশ গান গায়,—কিন্তু অনুরোধের উৎপীড়ন চলিলেই তাদের সঙ্গীত-শক্তি সঙ্কোচে কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া মরে!

যাক্ অলস আরামে শুইয়া থাকা নয়। সাতশো উনিশ যখন হাতছাড়া হইয়াছেই, এবং ওস্তাদকেও আজ হাতে পাইবার কোন সম্ভাবনা দেখিতেছি না, তখন,— সহকারী ডাক্তার হরিশ বাবু আর ডিমন্‌ষ্ট্রেটার সত্যেশ বাবুর কাযের সাহায্যে রওনা হওয়াই ভাল!

উঠিয়া আলমারীতে চাবি বন্ধ করিলাম, মনে মনে ভাবিলাম, যা হইবার হইয়াছে, অতঃপর এবার খুব হুঁসিয়ার হইয়া চলিব! কালই আমার হেড্‌ক্লার্ক আব্‌দুলের হাতে এই পাপের বোঝা ছাড়িয়া দিয়া ঝঞ্ঝাট-মুক্ত হইতেছি! সে ছোকরা বাবার হিসাব রক্ষার কাযে আমার চেয়ে ঢের বেশী মজবুত, এবং যথেষ্ট রকম বিশ্বাসী।

চাবিটা পকেটে ফেলিয়া টুপীটা দুহাতে বুকে চাপিয়া বাহিরের বারেণ্ডার দিকে যাইতেছি, এমন সময় কাণে গেল,—কিসের একটা গোলমাল! চৌকাঠের বাহিরে

পা বাড়াইয়া দেখিলাম,—বারেণ্ডার বিদ্যুৎ আলোটার কাছে দাঁড়াইয়া বোনটি কলকণ্ঠে চেঁচাইতেছে "আসুন, আসুন, ওস্তাদজি, দাদু আপনাকে এখনি খুঁজ্‌ছিলেন।"

সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখি, সেই বর্ষা-সন্ধ্যার বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে গাড়ী বারেণ্ডার নীচে একখানা ভাড়াটে গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। গাড়ীতে কতকগুলি মানুষ রহিয়াছে, দূর হইতে ঠাওর পাইলাম না,—কয়জন, কিন্তু সকলের আগেই চোখে পড়িল একটি আশ্চর্য্য-সুন্দরী কিশোরীর মুখ; সে মেয়েটি গাড়ীর ভিতর জানালার কাছে বসিয়া আছে।

আমি অবাক্! বোনটার উপর রাগ হইল,—এ রাক্ষসীটা কে গো! কাকে ডাকাডাকি করিয়া কার গাড়ী থামাইল?

অগ্রসর হইতেছি, দেখি বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে মাথায় চাদর ঢাকা দিয়া একজন গাড়ী হইতে নামিয়া বারেণ্ডায় উঠিল। বারেণ্ডার আলোয় লোকটির মুখ দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিলাম "আরে! সত্যি সত্যিই ওস্তাদ যে!"

"হাঁ, খাজুর তোমার নামে তলব দিলে, কি করি—তাই গাড়ী থামিয়ে নাম্‌লুম্, কি খবর ভাইজি ?"

ওস্তাদ আদর করিয়া ক্ষুদ্রকে, 'খাজুর' বলিয়া ডাকিত।—

ওস্তাদের কথায় হাসিয়া বলিলাম "খবর এমন কিছু সাংঘাতিক নয়, যার জন্যে এই বর্ষা বাদলের সন্ধ্যায় তোমার মত কাহিল মানুষকে ভিজিয়ে আন্‌বার সাহস রাখি !—কিন্তু এ সময় এদিক দিয়ে যাচ্ছিলে কোথা ?"

"মাড়োয়ারীদের একটা বিয়ে আছে, তাই জন্যে ভবানীপুরে মুজ রায় যেতে হচ্ছে !"

"ভবানীপুর ! এই বর্ষা ঘাড়ে করে ?"

· "কি ক'র ভাইজি ! পেটের দায় !"

নিরুত্তর হইলাম।—হায় রে, দরিদ্র—অভিশপ্ত জীবন !

ক্ষুদ্র ওস্তাদের হাত ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িয়া, সনির্ব্বন্ধ অনুরোধের স্বরে বলিল, "ওস্তাদজি, আপনার বোনটিকে বলুন না একবার নাম্‌তে, আমি দেখ্‌ব।"

"দেখবে ?" ওস্তাদ সস্নেহে হাসিল। থামিয়া একটু দুঃখিত ভাবে বলিল "উচু নীচুতে ওঠা-নামা করতে ওর বড় কষ্ট হয় খাজুর, ওর অসুখ হয়েছে।"

শরীর-তত্ত্ব আর চিকিৎসা-বিজ্ঞান লইয়া আমার কারবার; মানুষের অসুস্থতার সংবাদ কাণে ঢুকিলে মনটা উদাসীন থাকিতে পারে না! মুখ তুলিয়া উদাসীন ভাবে চাহিয়া বলিলাম, "কার অসুখ? কি হয়েছে?"

গাড়ীর সেই মেয়েটির দিকে চাহিয়া ওস্তাদ বলিল "আমার ওই বোনটির। আমাদের বংশগত পেশা, মেয়েদের এই নাচ গান,—পশ্চিমের জল-হাওয়ায় আমরা বেশ থাকি, কিন্তু এই বাংলাদেশে এসে আমরা কেউ শরীর রাখতে পারলুম না। গরীব আমরা, জাত ব্যবসা ছাড়লে উপায় নাই, কিন্তু মুজরার জন্যে এই রাত-জাগার পরিশ্রমে, অল্প বয়সেই বেচারার শরীর এমন ভেঙ্গেছে যে, আর ওর বিয়ে-থা দেবার আশা রাখি না।"—একটু থামিয়া, ব্যথিত ম্লান হাসির সহিত বলিল "কদিন বাঁচবে, তাই জানি না, ভয় হয় আমার চোখের ওপরই বুঝি চলে যায়, কোন দিন!"

ধ্বক্ করিয়া বুকে একটা ঘা লাগিল! মাথা হেঁট করিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলাম। পৃথিবীর অসীম বিপুলতার-মধ্যে সামান্য খানিকটা জায়গা আমাকেও নড়িয়া চড়িয়া দেখিতে হইয়াছে; অনেক শ্রেণীর অনেক মানুষ লইয়াই আমার সত্যকার 'আমিত্ব-টা'র আত্মোন্নতি সাধন চলিতেছে। বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সামাজিক প্রথা-পদ্ধতি, জীবন-যাত্রার রীতি-নীতির মধ্যে কত আশ্চর্য্য বিভিন্নতা, কত বিচিত্র আদর্শ আছে,—তার সংবাদ আমিও কিছু কিছু জানি; এবং সকলের চেয়ে বড় করিয়া সেই সত্যটা আমাকেও জানিতে হইয়াছে, যে সত্য এই রীতি-নীতি প্রথা-পদ্ধতিকেই সব চেয়ে বড় বলিয়া মানে না,—মানুষকে তার চেয়ে বড় বলিয়া, 'মানুষ' বলিয়াই মানে! যে শুচিতা, নিজের দম্ভে মানুষকে ছোট-নজরে দেখে, সে শুচিতার গর্ব্ব করিতে আমার অন্তরাত্মা সঙ্কোচের ব্যথায় মুহ্যমান হইয়া পড়ে! জানি না, এ আমার কি অপরাধ!—

চুপ করিয়া, অন্যমনস্ক হইয়া আছি, ইতিমধ্যে ওস্তাদদের সঙ্গে ক্ষুদুর কি একটা বিতর্ক সুরু হইয়া

গিয়াছিল, ভালরকম কাণে গেল না। নিজ মনেই নিঃশ্বাস ফেলিয়া ডাকিলাম—"ওস্তাদ—"

ক্ষুদুকে ছাড়িয়া চমকিয়া ব্যগ্রদৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া ওস্তাদ সাড়া দিল—"ভাই—"

আমি কি বলিতে উদ্যত হইয়াছিলাম, কিন্তু ক্ষুদু মাঝে পড়িয়া সবিজ্ঞ মধ্যস্থের মত ঘাড় মুখ নাড়িয়া বলিল "আমি বল্‌ছি, দাদু রুগী দেখ্‌তে ভালবাসেন, নিশ্চয় দেখ্‌বেন্‌,—আপনি একটিবার নাম্‌তে বলুন ওস্তাদজি।"

ওস্তাদ সঙ্কোচে বলিল "চুপ,—" আমার দিকে চাহিয়া বলিল "আজ তবে আসি ভাইজি, আদাব, আজ রাত জেগে কাল আর আস্‌তে পার্‌ব না, পর্শু সন্ধ্যায় তোমার এখানে আস্‌ব, ফুরসুৎ মিলবে ?"

নিশ্চয় করিয়া কিছু বলিবার নাই, আমিও যে, পীড়িত সাধারণের 'সেবক !' ইতস্ততঃ করিয়া দ্বিধার সঙ্গে স্বীকার জানাইয়া বলিলাম, "আজ কত রাত পর্য্যন্ত তোমাদের গান বাজনা চল্‌বে ?"

ওস্তাদ বলিল "এগারটা থেকে একটা। দু ঘণ্টার বেশী ওকে খাটতে দিই না, তাতে যা পাই।"—ফিরিতে

উদ্যত হইয়া সে পুনশ্চ বলিল "আসি তাহ'লে, আদাব।"

ভগবানের কাছে প্রত্যবায় অপরাধ ক্ষালনের জন্য, নিজেও মাথা ঝুঁকাইয়া কপালে হাত ঠেকাইলাম। ওস্তাদ বারেণ্ডার সিঁড়িতে নামিতে লাগিল।

ওস্তাদ হাত-ছাড়া হইল দেখিয়া ক্ষুদু ছুটিয়া আসিয়া আমার হাঁটু জড়াইয়া ধরিয়া ব্যাকুল অনুনয়ের স্বরে,—প্রায় চীৎকার করিয়াই বলিল, "আচ্ছা দাদু, ওস্তাদজীর বোনের এত অসুখ, তুমি একবারও দেখ্‌বে না? ওই তো গাড়ী, একবার নাম্‌তে বলো না।"

হায় রে শিশুর মন!—একবার দেখিলেই কি রোগীর রোগ আরোগ্য হয়? ওতে যে শুধু আমার আক্ষেপ দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠে! একবার দেখিয়া শুধু রোগটাই নির্ণয় করিতে পারি, কিন্তু তার পর? তার পর আমার চাই—চিকিৎসার অবসর, আর সকলের উপর বড় করিয়া চাই,—রোগীর সাহায্য; তার সদাচারে সুনিয়ম পালনের ধৈর্য্য! হায় রে এই সাহায্যটা যদি সর্ব্বত্র পাইতাম, তা হইলে এই অল্পদিনে আমিও যে

অনেক হতভাগ্য অনাচারীকে অকাল মৃত্যুর পথ হইতে ফিরাইতে পারিতাম! কিন্তু ওইটার অভাবে, সবই যে নিষ্ফল হইয়া যায়!

"দাদু, ও দাদু, বল না একবার ওস্তাদকে,—ওই ওস্তাদ দাঁড়িয়েছেন! বল, তোমার পায়ে পড়ি, বল নামাতে।"

চাহিয়া দেখিলাম, সত্যই ওস্তাদ সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া কুণ্ঠিত মুখে আমার দিকে চাহিয়া ইতস্ততঃ করিতেছে, চোখে তার সসঙ্কোচ আগ্রহ! চমকিয়া উঠিলাম,—আশ্চর্য্য! ওস্তাদ কি আমার কাছে কুণ্ঠাবোধ করিতেছে? না, না, পীড়িতের জন্য আমার কাছে সঙ্কোচের কিছু নাই। অনুতপ্ত চিত্তে তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া বলিলাম, "কি ওস্তাদ, তোমার আপত্তি আছে, একটু দাঁড়িয়ে যেতে? বলো তো, একবার দেখি তাহলে,—" ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিলাম, "এই তো মোটে আট্-টা, এখনো সময় আছে তোমাদের।"

"আপত্তি?" ওস্তাদ হাসিল' সসঙ্কোচে বলিল,—

"নিজের চিকিৎসার জন্যে, কত তকলিফ্ দিচ্ছি, তোমায় ভাইঝি, আবার,—"

"পাগল! নিয়ে এসো নামিয়ে, আমার এই অফিসেই দেখা যাক।"

পর্দ্দা সরাইয়া ঘরে ঢুকিলাম। একটু পরেই ওস্তাদের সঙ্গে একজন প্রৌঢ়া দাসী এবং আমার ছোট বোনটির হাত ধরিয়া ওস্তাদের ভগিনী ঘরে ঢুকিল; বসিতে চেয়ার দিলাম।

চিকিৎসাব্রতের সম্পর্কে মাতৃজাতির সংস্রবে আসিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছি, আজ আর বয়সের পার্থক্যে সঙ্কোচ আসে না। মাতৃজাতির সেবার জন্য যখন ডাক পড়ে, তখন আমার ভিতরেও একটা স্নেহ-কোমল 'মার প্রাণ' জাগিয়া উঠে,—সে সময় আমি ভুলিয়া যাই—বাহিরের সব ভেদ, সব পার্থক্য! নিজের মঙ্গলের জন্য, মানুষের মঙ্গল খুঁজিতে—মৃত দেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া শরীর-বিজ্ঞান শিখিয়াছি, নিজের দেহজ্ঞানটার উপর অন্ধ-আসক্তি রাখা আর কি চলে?

রোগ বিবরণ জানিবার জন্য জিজ্ঞাসাবাদ সুরু করিয়া মেয়েটির দিকে চাহিয়া বিস্মিত হইলাম, ভুল করিয়াছি আমি! এ তো কিশোরী নয়, তরুণী যে!

মুখশ্রীতে অল্পবয়স্কতার একটা কিশোর-কোমল মাধুর্য্য আছে, যে মাধুর্য্য মিতাচারী এবং সংযমী চরিত্রের মানুষের মুখে ভিন্ন অন্য কোথাও দেখা যায় না,—যদিও সুমুখে শারীরিক-দৌর্ব্বল্যের একটা করুণ ছায়া দেখিতেছি। কপালের ও চিবুকের গঠন, এবং চক্ষের দৃষ্টি দেখিয়া বলিলাম, এ নারী, সমাজের যে স্তরের জীব হইয়া যে কাজেই নিযুক্ত থাক, উচ্চশ্রেণীর বুদ্ধিচর্চ্চার শক্তি ভগবান্ একেও দিয়াছেন! সঙ্গীত-বিলাসীর চিত্তরঞ্জনের এর কতখানি ক্ষমতা জানি না, কিন্তু সমাজের শিক্ষয়িত্রী পদের অযোগ্য হইত না, বলিয়াই মনে হয়. যদি শিক্ষা-সাধনার সুযোগ দেওয়া হইত।

রোগ-বিবরণ শুনিয়া, পরীক্ষা করিয়া বুঝিলাম, জরায়ু প্রভৃতি যন্ত্রগুলির রুগ্ন-দুর্ব্বলতা দোষে, পাকস্থলী, হৃদ্‌পিণ্ড, মস্তিষ্ক সব যন্ত্রকটাই ক্লান্তি-দৌর্ব্বল্যে ভুগিতেছে। আপাততঃ এ ক্লান্তি মারাত্মক নয়, কিন্তু এটাকে বাড়িবার সুযোগ দিলে, শীঘ্রই দেহটা অকর্ম্মণ্য হইয়া ধ্বংসের পথে যাইবে।

রোগ নির্ণয়ের পর ঔষধ ঠিক করিয়া দিয়া, ঠোঁট

দুধানা বন্ধ করাই চিকিৎসা-ব্যবসায়ীর কর্ত্তব্য।—রোগটা উৎপত্তির কারণ কি, স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের তরফ হইতে সেটার সন্ধান লইয়া অপ্রিয় সত্য আবিষ্কার করায় আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থহানির আশঙ্কা! ব্যবসায়ের ক্ষতি! !—কারণ রোগীরা রুষ্ট হন!

জানি সব।—কিন্তু ওই ব্যবসায়টার চরণে দাসখৎ লিখিয়া আমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না, আমার চিন্তাশক্তি বিজ্ঞানের আলো ধরিয়া, সত্যানুসন্ধানে ছুটিতে চায় যে! লোক-সমাজের অপ্রিয়ভাজন হইবার ভয়ে, সত্যের পথ রুথিয়া আত্মঘাতী হইতে পারিব না! মানুষ আমি,—মানুষের অকল্যাণকে প্রশ্রয় দান করি, কোন সাহসে?

মনকে শক্ত করিয়া হেতুর হিসাব মিলাইতে সুরু দিলাম। দারিদ্র্যের অনিবার্য্য ফল,—অপুষ্টিকর অল্প আহার, অস্বাস্থ্যকর বাসস্থান, গুরুতর পরিশ্রম, অতিরিক্ত রাত্রিজাগরণ,—মানসিক স্বাচ্ছন্দ্যহীনতা?... ...বাঃ! সমস্তই যে অবিচলিত ধৈর্য্যে, নির্ব্বিকার ভাবে স্বীকৃত হইল? মনে আফ্‌শোস্‌ হইল,

আহা ! এর উপর যদি বাল্যবিবাহের উপসর্গটা থাকিত, তবে আয়োজনটা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইত !— কাউকে কিছু ভাবনা চিন্তার অবসর না দিয়া, বেচারা এতদিন অক্লেশে ভবপারে গিয়া—স্বচ্ছন্দে হাফ ছাড়িয়া বাঁচিত !

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চেয়ার ঘুরাইয়া বসিয়া ঔষধের ব্যবস্থাপত্র লিখিতে সুরু দিলাম,—মনটা অশান্তিতে খিচ্ খিচ্ করিয়া উঠিল, আরও কিছু কারণ খুঁজিবার নাই কি ? এইখানেই নিশ্চিন্ত হওয়া কি চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কর্ত্তব্য ?

অজ্ঞাতেই আমার হাত হইতে কলম খসিয়া পড়িল ; দ্বিধা-পীড়িত চিত্তে, ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম।

স্নেহ-ব্যাকুল ওস্তাদ তখন অনর্গলচ্ছন্দে আক্ষেপ সুরু করিয়াছে,—দারিদ্র্য-পীড়িত রুগ্ন ভাইকে, কঠোর পরিশ্রমের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্যই, বোনটা নিজের প্রতি এমন নির্দ্দয় নির্ম্মম হইয়া,—আত্ম-বলিদানে অগ্রসর হইয়াছে ! এখন ভাইকে যদি বাঁচাইতে হয়, তবে বোনটি মরিবে,—আর বোনকে যদি বাঁচাইতে হয়, তবে ভাইয়ের মৃত্যু অনিবার্য্য ! এর চেয়ে করুণাময় খোদা

যদি দুজন হতভাগ্যকেই একদিনে দুনিয়া হইতে সরাইয়া দেন, তবে দুজনেই পরস্পরের জন্য, চির দুর্ভাবনার হাত এড়াইয়া শান্তি পায়!

আমি নিস্তব্ধ!—

ওস্তাদের আক্ষেপ চলিতে লাগিল “বাপ মার সতেরটা সন্তানের মধ্যে আজ আমরা দুটি ভাই-বোন বেচে আছি, বাকী সব অসময়ে চলে গেছে। বাপ ছিল, মদ-মাতালে অদ্ভুতখেয়ালী লোক,—মদ খেয়ে খেয়ে অকালে মারা গেল, আর মা ছিল আমাদের চির অসুস্থ,—ঠিক এই বোনটার মত অসুখে চিরদিন ভুগে ভুগে মারা পড়ল......!”

বুকটা ধ্বক্ করিয়া লাফাইয়া উঠিল! এতক্ষণ বাহিরের অনুষ্ঠান লইয়া খুঁজিয়া মরিতেছি, এইবার—এতক্ষণের পর রোগের মূল কারণ আবিষ্কৃত হইল। মাতৃগত ব্যাধি! জন্মগত অসাবধানতার ফল!—যাক্, তাই তো ভাবিতেছি,—এই অল্প বয়সে কুমারী-জীবনে এ বেচারী এত জখম হয় কেন?—হায় ভগবান, কার অনাচার পাপের দণ্ড, কে ভোগ করে!

প্রেস্‌ক্রুপ্‌সান ছিঁড়িয়া ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। শুধু দু দশ শিশি ঔষধে এ রোগের মূলোচ্ছেদ হইবে না। এর প্রতিকারের জন্য চাই,—অনেক সুনিয়ম পালন! চাই—জীবন যাত্রার প্রণালীটার আমূল সুসংস্কার! না হইলে সবই ভস্মে ঘি ঢালা।

শান্ত স্বরে বলিলাম "ওস্তাদ, পশু' সন্ধ্যায় তোমার আস্‌তেই হবে। তোমাকে অনেক বিষয় জানাবার আছে, সেই সময় বল্‌ব। আজ আপাততঃ শুধু—এই ওসুদটা।"

আশু বেদনার অবসাদ-হারী একটা ঔষধ দিলাম। সেইখানে বসিয়া, ঔষধ সেবন করিয়া তাহারা সদলে বাহির হইল; দুয়ার পর্য্যন্ত আগাইয়া আসিয়া, গভীর নিঃশ্বাস ছাড়িয়া চেয়ারে বসিলাম, আবার ভাবিতে লাগিলাম।

আজকের লোক্‌সানের সন্ধ্যায়, নিজের লোকসানটার হিসাব করিতে গিয়া,—নিজের অসতর্কতার জন্য মনে মনে পিতার উপর অভিযোগ আনিতেছিলাম! এখন দেখিতেছি পৃথিবীর অনেক

প্রাণঘাতী লোকসানের জন্য, অনেক পিতামাতার উপর অনেক অভিযোগ আনিবার আছে, যার হিসাব নাই। কি নিদারুণ মনস্তাপ !

ক্ষুদু ধীরে ধীরে আসিয়া চেয়ারের পাশে দাঁড়াইয়া নিজমনে মন্তব্য-ভঞ্জন সুরু করিল, "ওস্তাদের বোনটীর বেশ হাসি হাসি মুখ, বেশ মিষ্টি মিষ্টি কথা ; আমার সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেছে, জানলে দাড়ু ! আচ্ছা, ওর এমন অসুখ হোল কেন বল দেখি ?"

সংক্ষেপেই—উদাস ভাবে উত্তর দিলাম—"কর্ম্মফল !"

অন্তরের অন্তরীক্ষে, নিষ্ফল ক্ষোভে—একটা ক্ষিপ্ত বেদনা হাহাকার করিয়া উঠিল,—'এ কর্ম্মফল কে নিজ হাতে গড়িতেছে,—কে গো, কে ?'

সমাপ্ত

আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালা

মূল্যবান্ সংস্করণের মতই—

কাগজ, ছাপা, বাঁধাই—সর্ব্বাঙ্গসুন্দর।

—আধুনিক শ্রেষ্ঠ লেখকের পুস্তকই প্রকাশিত হয়।—

বঙ্গদেশে যাহা কেহ ভাবেন নাই, আশাও করেন নাই। আমরাই ইহার প্রথম প্রবর্ত্তক। বিলাতকেও হার মানিতে হইয়াছে—সমগ্র ভারতবর্ষে ইহা নূতন সৃষ্টি। বঙ্গসাহিত্যের অধিক প্রচারের আশায় ও যাহাতে সকল শ্রেণীর ব্যক্তিই উৎকৃষ্ট পুস্তক পাঠে সমর্থ হন, সেই মহৎ উদ্দেশ্যে আমরা এই অভিনব 'আট-আনা-সংস্করণ' প্রকাশ করিয়াছি।

মফঃস্বলবাসীদের সুবিধার্থ, নাম রেজেষ্টী করা হয়; গ্রাহকদিগের নিকট নবপ্রকাশিত পুস্তক ভিঃ পিঃ ডাকে প্রেরিত হয়। পূর্ব্ব প্রকাশিতগুলি একত্র, বা পত্র লিখিয়া, সুবিধানুযায়ী, পৃথক্ পৃথকও লইতে পারেন।

ডাকবিভাগের নূতন নিয়মানুসারে মাশুলের হার বর্দ্ধিত হওয়ায়, গ্রাহকদিগের প্রতি পুস্তক ভিঃ পিঃ ডাকে ।৵০ লাগিবে। অ-গ্রাহকদিগের ।৶০ লাগিবে।

গ্রাহকদিগের কোন বিষয় জানিতে হইলে, "গ্রাহক-নম্বর" সহ পত্র দিতে হইবে।

প্রতি বাঙ্গালা মাসে একখানি নূতন পুস্তক প্রকাশিত হয়;—

১। অভাগী (৬ষ্ঠ সংস্করণ)—রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর।
২। ধর্ম্মপাল (৩য় সং)—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ।
৩। পল্লীসমাজ (৬ষ্ঠ সং)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
৪। কাঞ্চনমালা (২য় সং)—শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম-এ।
৫। বিবাহ-বিপ্লব (২য় সং)—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম-এ, বি-এল।
৬। চিত্রালী (২য় সং)—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বি-এ।
৭। দুর্ব্বাদল (২য় সং)—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত।
৮। শাশ্বত ভিখারী (২য় সং)—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়।
৯। বড়বাড়ী (৫ম সংস্করণ)—রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর।
১০। অরক্ষণীয়া (৬ষ্ঠ সং)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
১১। ময়ুখ (২য় সং)—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ।
১২। সত্য ও মিথ্যা (২য় সং)—শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।
১৩। রূপের বালাই (২য় সং)—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।
১৪। সোণার পদ্ম (২য় সং)—শ্রীসরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৫। নাইকা (২য় সংস্করণ)—শ্রীমতী হেমনলিনী দেবী।
১৬। আলেয়া (২য় সংস্করণ)—শ্রীমতী নিরুপমা দেবী।
১৭। বেগম সমরু (সচিত্র)—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৮। নকল পাঞ্জাবী (২য় সংস্করণ)—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত।
১৯। বিল্বদল—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত।
২০। হালদার বাড়ী—শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।
২১। মধুপর্ক—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

২২। লীলার স্বপ্ন—শ্রীমনোমোহন রায়, বি এ।

২৩। সুখের ঘর (২য় সং)—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত, এম-এ।

২৪। মধুমল্লী—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

২৫। রসির ডায়েরী—শ্রীমতী কাঞ্চনমালা দেবী।

২৬। ফুলের তোড়া—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী।

২৭। ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

২৮। সীমন্তিনী—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

২৯। নব বিধান—অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ।

৩০। নববর্ষের স্বপ্ন—শ্রীসরলা দেবী।

৩১। নীল মাণিক—রায় বাহাদুর শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, ডি-লিট।

৩২। হিসাবনিকাশ—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম-এ, বি-এল।

৩৩। মায়ের প্রসাদ—শ্রীবারেন্দ্রনাথ ঘোষ।

৩৪। ইংরেজী সাহিত্যের কথা—শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায়, এম-এ।

৩৫। জলছবি—শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

৩৬। শয়তানের দান—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

৩৭। ব্রাহ্মণ-পরিবার—(২য় সংস্করণ) শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

৩৮। পথে-বিপথে—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সি-আই-ই।

৩৯। হরিশ ভাণ্ডারী (৩য় সংস্করণ) রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর।

৪০। কোন্ পথে—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত, এম-এ।

৪১। পরিণাম—শ্রীগুরুদাস সরকার, এম এ।

৪২। পল্লীরাণী—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

৪৩। ভবানী—৺নিত্যকৃষ্ণ বসু।

৪৪। অমিয় উৎস—শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।

৪৫। অপরিচিতা (২য় সং)—শ্রীপান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ।

৪৬। প্রত্যাবর্ত্তন—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বসুমতী-সম্পাদক।

৪৭। দ্বিতীয় পক্ষ—শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম্-এ, ডি-এল।

৪৮। ছবি (২য় সং)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৪৯। মনোরমা—শ্রীমতী সরসীবালা দেবী।

৫০। সুরেশের শিক্ষা—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম-এ।

৫১। নাচওয়ালী—শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ।

৫২। প্রেমের কথা—শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ।

৫৩। গৃহহারা—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫৪। দেওয়ানজী—শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

৫৫। কাঙ্গালের ঠাকুর—রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর।

৫৬। গৃহদেবী (২য় সংস্করণ)—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার।

৫৭। হৈমবতী—৺চন্দ্রশেখর কর।

৫৮। বোঝাপড়া—শ্রীনরেন্দ্র দেব।

৫৯। বৈজ্ঞানিকের বিকৃত বুদ্ধি—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়।

৬০। হারান ধন—শ্রীনসীরাম দেবশর্ম্মা।

৬১। গৃহ-কল্যাণী—শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল।

৬২। সুরের হাওয়া—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু, বি-এস্ সি।

৬৩। প্রতিভা—শ্রীবরদাকান্ত সেন গুপ্ত।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শশিনাথ

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—

মূল্য আড়াই টাকা।

লীলা-সরযূর ফোটে ফোটে তবু ফোটে না প্রেম ;—ঊর্ম্মিলার সুস্পষ্ট সুব্যক্ত পতিপ্রেম,—বরেনের একনিষ্ঠ সংযত প্রেম ;—শশিনাথের গঙ্গোর্ম্মি তুল্য উদ্দাম, অবাধ, হারাইয়া যাওয়া, হঠাৎ ফিরিয়া পাওয়া, অস্থিরগতি প্রেম—সুধীরের ঝড়ের বেগে আগন্তুক ও শরের বেগে পলাতক প্রেম—প্রকাশের 'বদলে গেল যতটা গোছের' কপট প্রেম—প্রেম বিবিধ ও বিচিত্র রঙ্গ ও লীলা এই একখানি গ্রন্থে সুনিপুণ ভাবে চিত্রিত হইয়াছে।

প্রবাসী বলেন—শশিনাথ একখানি উপন্যাস—পারিবারিক ও সামাজিক উপন্যাস শ্রেণীর। গল্পের প্লট নিতান্ত ঘরোয়া, কিন্তু সেই ঘরোয়া প্লটকে ঘোরালো করিয়া, লেখক বিশেষশক্তির ও মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়াছেন। এই বইখানি পড়িয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি—লেখক অসাধারণ শক্তির শিল্পচাতুর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন।

বসুমতী বলেন—পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ আনন্দ অনুভব করিয়াছি। দর্শনের জটিল সমস্যা অপেক্ষাও যে মানুষের মনের সমস্যা অধিক জটিল, তাহা পুস্তকে দেখান হইয়াছে। পুস্তকখানি সুখপাঠ্য। ইহাতে গ্রন্থকারের যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচয় আছে।

ভূ-প্রদক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চল পরিদর্শন

প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক ব্যারিষ্টার চন্দ্রশেখর সেন প্রণীত

লণ্ডন ও ফ্রান্সের ৩২৮ পৃষ্ঠা ব্যাপী ভ্রমণ কাহিনী।

বহুকাল পরে, বহু অর্থব্যয়ে, বহুপরিশ্রমলব্ধ

চিত্র-শোভিত হইয়া—

ভূ-প্রদক্ষিণ—১ম খণ্ড আবার প্রকাশিত হইল।

এরূপ চিত্রভূষিত সংস্করণ পূর্ব্বেকখনও

বাহির হয় নাই।

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী এম-এ

সমাজ সংস্কার মূলক—

—সামাজিক উপন্যাস—

পাপকে ঘৃণা কর,—পাপীকে ঘৃণা করিয়ো না,—এই মহাবাক্যের অনুসরণ করিয়া গ্রন্থকার অতি সুকৌশলে দেখাইয়াছেন, পাপ ধুইয়া মুছিয়া শুদ্ধ করিয়া লইলে পতিতার সহিত গৃহস্থ কন্যার বিশেষ কোন পার্থক্য থাকে না। তুলা ভরা অতি সুন্দর সিল্কের বাঁধাই

মূল্য পাঁচ সিকা।

মেজ বউ

৺শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত—মূল্য ১৲

ইহার ছত্রে ছত্রে মধুরতা পদে পদে কমনীয়তা :
প্রমদার আদর্শে ভগ্নী, কন্যা প্রভৃতি
আত্মীয়াদের চরিত্র গঠন করুন। কঠিন মর্ত্ত্যভূমি
কমনীয় স্বর্গে পরিণত হইবে। এমন অনেক স্থান পাইবেন
প্রাণ ভরিয়া কাঁদিয়া
তৃপ্তিলাভ করিবেন। প্রবোধের মত মানুষ হইতে সকল
ব্যক্তিরই চেষ্টা করা উচিত। ইহা পাঠে ঘরে ঘরে

"মেজ বউ"

বিরাজ করিবে।

নূতন সংশোধিত সংস্করণ রঙ্গিন এণ্টিকে ছাপাই
দুইখানি ত্রিবর্ণের ও
একখানি এক বর্ণের চিত্র আছে।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা